সেকেন্দার।—আন্টিগোনাস্!

[আন্টিগোনাস্ লজ্জায় শির অবনত করিলেন।]

সেকেন্দার।—আন্টিগোনাস্! তোমার এই ঔদ্ধত্যের জন্য তোমায় আমার সাম্রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত করলাম। একজন সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষের এতদূর স্পর্দ্ধা! আমি এতক্ষণ বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে চেয়ে ছিলাম। তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা হ'তে পারে, তা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।—যাও, এই মুহূর্ত্তেই তোমায় নির্ব্বাসিত ক'র্লাম। [আন্টিগোনাসের প্রস্থান]

সেকে।—আর সেলুকস্! তোমার অপরাধ তত নয়; কিন্তু ভবিষ্যতে স্মরণ রেখো যে, গ্রীক্‌-সম্রাটের সম্মুখে চক্ষু রক্তবর্ণ করা গ্রীক্‌-সেনাপতির শোভা পায় না।—আর, যুবক!

চন্দ্রগুপ্ত।—সম্রাট্!

সেকে।—তোমায় যদি বন্দী করি

চন্দ্র।—কি অপরাধে সম্রাট্?

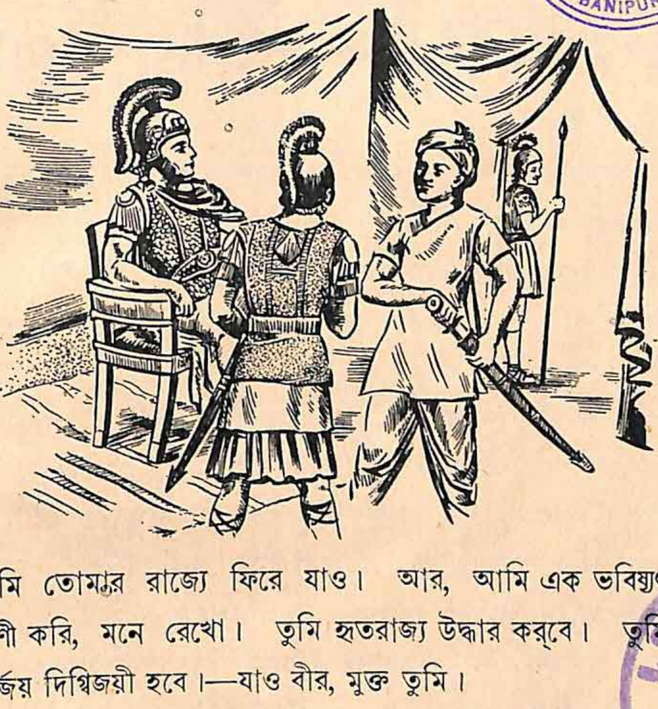
সেকে।—আমার শিবিরে তুমি শত্রুর গুপ্তচর হ'য়ে প্রবেশ ক'রেছ, এই অপরাধে।

চন্দ্র।—এই অপরাধে?—ভেবেছিলাম, সেকেন্দার শাহ বীর, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, তিনি ভীরু। এক গৃহহীন হিন্দু রাজপুত্র ছাত্রহিসাবে তাঁর কাছে উপস্থিত, তাতেই তিনি ত্রস্ত। সেকেন্দার শাহ এত কাপুরুষ, তা ভাবি নাই।

সেকে।—সেলুকস্!—বন্দী কর!

চন্দ্র।—সম্রাট্! আমায় বধ না ক'রে বন্দী ক'র্তে পার্‌বেন না। [তরবারি বাহির করিলেন]

সেকেন্দার।—[সোল্লাসে] চমৎকার!—যাও বীর! তোমায় বন্দী ক'র্‌ব না। আমি পরীক্ষা ক'রছিলাম মাত্র। নির্ভয়ে



তুমি তোমার রাজ্যে ফিরে যাও। আর, আমি এক ভবিষ্যৎ বাণী করি, মনে রেখো। তুমি হৃতরাজ্য উদ্ধার কর্‌বে। তুমি দুর্জ্জয় দিগ্বিজয়ী হবে।—যাও বীর, মুক্ত তুমি।

—৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

অনুশীলনী

১। সেকেন্দার শাহ সম্বন্ধে যাহা জান তাহা নিজের ভাষায় লিখ।
২। চন্দ্রগুপ্ত কে ছিলেন? তাঁহার সম্বন্ধে কি জান, বল।
৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ বল :—
বাহিনী-চালনা, ব্যূহ-রচনা-প্রণালী, দুর্ব্বার, সংঘাত, ঔদ্ধত্য, দিগ্বিজয়ী।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্য-শিক্ষা-পর্ষৎ কর্ত্তৃক ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যরূপে অনুমোদিত
(নোটিফিকেশন নং Syl/82/54. তারিখ ২৭।১২।৫৪)

চয়নিকা

প্রথম ভাগ

(ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য)

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী এম-এ
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

দি গ্লোব লাইব্রেরী
২নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মূল্য বার আনা মাত্র

প্রকাশক—
শ্রী বি, বসু
দি গ্লোব লাইব্রেরী
২নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—
শ্রীনরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়
স্বপ্না প্রেস লিমিটেড
৮।১, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ

সঙ্কল্প

আমরা মানুষ হব ; নির্ভীক মুক্ত খাঁটি মানুষ হব। নূতন স্বাধীন ভারত আমরা ত্যাগ, সাধনা ও প্রচেষ্টার বলে গড়ে তুলব। আমাদের ভারতমাতা আবার রাজ-রাজেশ্বরী হবেন ; তাঁর গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত হব। কোনও বাধা মানব না ; কোনও ভয়ে আমরা ভীত হব না। আমরা নূতনের সন্ধানে অজানার পশ্চাতে চল্‌ব। জাতির উদ্ধারের দায়িত্ব আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে, বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করব। ঐ ব্রত উদ্‌যাপন করে আমরা আমাদের জীবন ধন্য করব। ভারতবর্ষকে আবার বিশ্বের দরবারে সম্মানের আসনে বসাব। শ্রদ্ধাবনত মস্তকে গললগ্নীকৃতবাসে মাতৃচরণে সমবেত হয়ে করযোড়ে বলব—"পূজার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ, অতএব জননি, জাগৃহি !"

—নেতাজী সুভাষচন্দ্র



অনেক দিন পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছিলেন, 'বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি'। কথাটা খুবই সত্য। শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালার পূর্ব্ব গৌরবের কথা এবং সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞতার কথা ভাবিয়াই ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি সেই সকল কথার পুনরুল্লেখ না করিয়া কেবল দুই একটি বিষয়ের আলোচনা করিব। যে কয়টি দোষ বাঙ্গালীর মজ্জাগত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস, তাহা যে পুরাকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের চরিত্রে ছিল না, ইহা দেখানই আমার উদ্দেশ্য।

বাঙ্গালী কোন বড় ব্যাপারে একমত অবলম্বন করিয়া কাজ করিতে পারে না,—ইহা বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে মস্ত একটা অভিযোগ; কিন্তু ইহা যে বাঙ্গালী-চরিত্রের মজ্জাগত দোষ নহে, প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনাই তাহার প্রমাণ। সেই ঘটনার কথাই তোমাদিগকে বলিতেছি।

প্রায় বার শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার বড় দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশাল

বঙ্গ-সাম্রাজ্য তখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশ তখন খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত। সুযোগ পাইয়া বিদেশীয় নৃপতিগণ পুনঃপুনঃ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া ইহাকে বিপর্য্যস্ত করিতেছিলেন। সমগ্র দেশের উপর কোন রাজশক্তি ছিল না, ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণ স্বাধীন রাজার ন্যায় প্রজাশাসন করিতেন, এবং তাঁহাদের আত্মকলহ ও যুদ্ধবিগ্রহের ফলে প্রজাদের দুঃখকষ্টের আর অবধি ছিল না।

এই অরাজকতা ও অত্যাচারের হাত হইতে উদ্ধারের কোন উপায় না দেখিয়া, অবশেষে বাঙ্গালী নায়কগণ এক মহৎ সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহারা সকলেই স্বীয় স্বার্থ ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে একজনকে সমগ্র দেশের অধিপতি বলিয়া মনোনীত করিলেন, এবং স্বেচ্ছায় নিজেদের সমস্ত অধিকার ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিলেন। অচিরে আবার বঙ্গদেশে সুখশান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিল। জগতের ইতিহাসে এরূপ অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ সত্যই বিরল।

বাঙ্গালীর আত্মত্যাগ ব্যর্থ হয় নাই। বাঙ্গালীর নির্ব্বাচিত রাজা গোপাল বঙ্গদেশকে একটি প্রবল রাজ্যে পরিণত করেন।

তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল বঙ্গদেশ হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন।

বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ এই যে, বাঙ্গালী ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিমুখ; কোনরূপ বিপজ্জনক অথবা অনিশ্চিত জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তে নিশ্চিন্ত মনে গৃহসুখ ভোগ করাই তাহাদের জীবনের লক্ষ্য। ইহার বিরুদ্ধে প্রাচীন বাঙ্গলার ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে।

বাঙ্গালার প্রাচীন বন্দর তাম্রলিপ্ত (বর্ত্তমান তমলুক) হইতে জাহাজে চড়িয়া সমুদ্র পার হইয়া বাঙ্গালী একদিন সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলি, বর্ণিও এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অসংখ্য দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য করিতে যাইত। তখনকার দিনে ছোট ছোট কাঠের জাহাজে অজ্ঞাত পথে অসীম সমুদ্র পার হইবার মত সাহস যাহাদের ছিল, তাহারা ভীরু, দুর্ব্বল এবং দুঃসাহসহীন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী দুর্দ্ধর্ষ বাঙ্গালী সমুদ্র-যাত্রা করিয়াছে। ধনপতি সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার কাহিনী কবির কল্পনা হইতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্য দিয়া প্রাচীন বাঙ্গালীর যে সাহস, দৃঢ়তা, ভীতিশূন্যতা এবং ব্যবসায়-প্রীতির চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপেই ঐতিহাসিক সত্য। সিংহলের ইতিহাসে বর্ণিত বাঙ্গালী বিজয়সিংহের অভিযানকাহিনীরও অন্ততঃ এই দিক্ হইতে মূল্য আছে।

কিন্তু কেবল রাজ্যজয় ও বাণিজ্যের জন্যই বাঙ্গালী সমুদ্র-যাত্রা করে নাই। বাঙ্গালার অনেক ধর্ম্মবীর ধর্ম্মের প্রেরণায় সমুদ্র পার হইয়া দূর বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়াছেন। যে শৈলেন্দ্র-বংশীয় পরাক্রান্ত সম্রাটগণ মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও প্রশান্ত মহাসাগরের অগণিত দ্বীপপুঞ্জে রাজত্ব করিতেন,—আরব বণিক্‌দিগের মতে যাঁহাদের সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া আসিতে দুই বৎসর সময় লাগিত,—তাঁহারাও বাঙ্গালী ধর্ম্মবীরকে গুরুপদে বরণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন। শৈলেন্দ্র-বংশের শিলালিপিতে রাজগুরু বাঙ্গালী

কুমার ঘোষের এবং তাঁহার নির্দ্দেশ মতে যে বিশাল দেবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ আছে।

অন্যদিকে বিশাল হিমালয় পার হইয়া বহু বাঙ্গালী ধর্ম্মপ্রচারক যে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তিব্বতীয়েরা আজও তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করে। শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ সম্মান পাইয়াছিলেন। এখনও তিব্বতের ঘরে ঘরে দেবতার ন্যায় তাঁহার পূজা হয়।

বাঙ্গালী আজ ঐক্য, সাহস, উৎসাহও কর্ম্মশক্তির অভাবে অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছে। আজ আমাদের প্রাচীন বাঙ্গালার গৌরব স্মরণ করিবার দিন আসিয়াছে। আমাদের মধ্যেও যে মহত্ত্বের বীজ আছে, উপযুক্ত আবহাওয়ায় তাহা আবার অঙ্কুরিত হইতে পারে, এই ধারণা বদ্ধমূল হইলে আবার আমরা বুকে বল বাঁধিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব। বাঙ্গালার মাটি ও বাঙ্গালার জল যে কেবল কোমল-কান্ত পদাবলীর ক্ষেত্র নহে, মনুষ্যত্বের কঠিন উপাদানগুলিও যে ইহার মধ্যে নিহিত আছে, আজ তাহা স্মরণ করিয়া আমরা যেন জীবনযাত্রার কঠোর সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারি।

—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার (পরিবর্ত্তিত)

অনুশীলনী

১। বাঙ্গালীকে 'আত্মবিস্মৃত জাতি' বলা হইয়াছে কেন ?

২। যে দোষগুলিকে সাধারণে বাঙ্গালীর মজ্জাগত বলিয়া মনে করে, সেগুলি যে বাঙ্গালীর পূর্ব্বপুরুষদের চরিত্রে ছিল না, তাহা কিরূপে বুঝিতে পারা যায় ?

কোকিল



কোকিলের ডাক তোমরা অনেকে শুনিয়াছ। ইহাদের চেহারা ভালো করিয়া দেখিয়াছ কিনা জানি না। কোকিলের স্ত্রী ও পুরুষদের চেহারা সম্পূর্ণ পৃথক্। পুরুষ-কোকিলের গায়ের সব পালকের রঙ্ চক্‌চকে কালো। চোখ দু'টি আবার সুন্দর লাল। কিন্তু ঠোঁটের রঙ্ যেন কতকটা সবুজ রকমের। ইহারাই ফাল্গুন হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত "কু-উ, কু-উ" করিয়া ডাকে। ইহাদের গলার স্বর অতি মিষ্ট। কিন্তু বারো মাস এই রকম স্বরে ডাকিতে পারে না। আষাঢ় মাস হইতে কেবল "কুহু কুহু কুক্ কুক্" শব্দ ছাড়া অন্য সুর তাহাদের গলা হইতে বাহির হয় না। খুব ভোরবেলায় যখন কোকিলরা এই রকমে ঝঙ্কার দেয়, তখন কিন্তু সেই শব্দ বেশ ভালই লাগে।



পুরুষ কোকিল

স্ত্রী-কোকিলদের গায়ের রঙ্ কতকটা খয়েরি। তাহারি উপরে আবার সাদা ডোরা ও ছিটা-ফোঁটা থাকে। লোকে ইহাদের তিলে কোকিল বলে। আমরা ছোটবেলায় ভাবিতাম,

তিলে কোকিলরা পৃথক্ জাতের কোকিল। কিন্তু তাহা নয়, ইহারাই স্ত্রী-কোকিল। স্ত্রী-কোকিলরা "কু-উ কু-উ" করিয়া ডাকিতে পারে না। ইহাদের গলার স্বর কি রকম যেন ভাঙা-ভাঙা, বিশ্রী। লোকে বলে, কোকিলরা বর্ষাকালে আমাদের



স্ত্রী কোকিল

দেশ ছাড়িয়া পালায় এবং তার পরে ফাল্গুন মাসে আবার এদেশে আসে। বোধ করি, কোকিলদের সেই "কু-উ কু-উ" মিষ্ট ডাক শুনিতে না পাইয়া লোকে ঐ কথা বলে। কিন্তু উহা ঠিক কথা নয়। কোকিলেরা বারো মাসই আমাদের দেশে থাকে। আষাঢ় মাস পড়িলেই তাহাদের গলার স্বর বন্ধ হইয়া যায় এবং তাহাদের স্ফূর্তিও কমিয়া যায়, তাই সেই ভোর রাত্রির ঝঙ্কার ছাড়া তাহাদের আর সাড়া-শব্দই পাওয়া যায় না। এই কয়েকটা মাস তাহারা গাছের পাতার আড়ালে লুকাইয়া অশথ বট প্রভৃতির ফল ও পোকা-মাকড় খাইয়াই কাটায়। তারপর ফাল্গুন মাসে যেই দক্ষিণে বাতাস গায়ে লাগে, অমনি তাহাদের স্ফূর্তি বাড়িয়া যায়; তখন গলা ছাড়িয়া ডাকিতে আরম্ভ করে।

"কা-কা" করিয়া কোকিলকে তাড়া করে। কিন্তু কোকিল চালাক পাখী ; কাকের তাড়ায় ভুলে না। "কিক্-কিক্—কুক্-কুক্" শব্দ করিতে করিতে তাহারা পালাইবার ভান করে, এবং কাকেরা বাসা ছাড়িয়া পিছনে পিছনে ছুটিয়া চলে। এই রকমে কাকেরা যখন বাসা ছাড়িয়া কোকিলকে তাড়াইবার জন্য খুব দূরে যায়, তখন স্ত্রী-কোকিল পাতার আড়াল হইতে বাহির হইয়া কাকের বাসায় ডিম পাড়ে। কেবল ইহাই নয়, যদি বাসা কাকের ডিমে ভরা থাকে, তবে স্ত্রী-কোকিলরা দুই চারিটা ডিম মাটিতে ফেলিয়া দিয়া সেই শূন্য জায়গায় নিজেদের ডিম পাড়ে। দেখ কোকিলরা কত দুষ্ট। কাকেরা বোধ হয় মনে ভাবে, তাহারাই পাখীদের মধ্যে বুদ্ধিমান। কিন্তু কোকিলদের কাছে তাহাদের প্রায়ই হার মানিতে হয়।

—শ্রীজগদানন্দ রায়

অনুশীলনী

১। পুরুষ-কোকিল এবং স্ত্রী-কোকিলের চেহারা এবং স্বভাবের পার্থক্য কোথায় ?

২। কোকিল কি করিয়া কাকের চোখে ধূলা দিয়া তাহার বাসায় ডিম রাখিয়া আসে ?



হাত উঠায়া ঘর

ভারতের অদ্বিতীয় গায়ক তানসেনের নাম তোমরা সকলেই বোধ হয় শুনেছ। আজও আমাদের দেশের বড় বড় গায়কেরা মিঞা তানসেনের নামে কপালে হাত ঠেকিয়ে বার বার সেলাম ঠুকে থাকেন। কালোয়াতের দল আজও আসরে গান স্বুরু করবার পূর্ব্বে বীণাপাণির এই বরপুত্রটিকে স্মরণ করে ডান হাত দিয়ে নাসিকা ও কর্ণমূল তিনবার স্পর্শ করে থাকেন। এতবড় গায়ক ছিলেন এই মিঞা তানসেন।

প্রবাদ আছে, ইনি এতবড় গুণী ছিলেন যে, মেঘমল্লার ভেঁজে খর গ্রীষ্মের রৌদ্রদগ্ধ নীলাকাশকে নিমেষে মেঘাচ্ছন্ন করে তুলতে পারতেন। আবার দিল্লীর দারুণ শীতে মানুষ যখন হি-হি করে কাঁপছে, সেই সময় দীপক রাগ ভেঁজে তিনি দারুণ রৌদ্রতাপে সকলকে অতিষ্ঠ করে তুলতেন।

এই সব আজগুবি গল্প তোমাদের বিশ্বাস করতে বলি না; কিন্তু এথেকে বুঝতে পারছ, এদেশের লোকেরা তানসেনকে কি চক্ষে দেখত।

এহেন তানসেনেরও একজন ওস্তাদ্ ছিলেন। বাবারও বাবা আছেন। স্বুতরাং ওস্তাদ্ তানসেনরও ওস্তাদ্ থাকা কিছু বিচিত্র নয়। এই ওস্তাদ্জীটির নাম ছিল হরিদাস স্বামী।

সাকরেদের গুণপনার কথা ত শুনলে, এখন ওস্তাদ্‌জীর গুণপনার কথাটা একবার কল্পনায় ভেবে দেখ !

হরিদাস ছিলেন সাধু প্রকৃতির লোক। বৃন্দাবনের এক নির্জ্জন বনে, লোকালয় থেকে বহুদূরে একটি কুটীর রচনা করে সেইখানেই তিনি বাস করতেন, আর সকাল-সন্ধ্যায় তানপুরাটি তুলে নিয়ে আপন মনে ভগবানের গুণকীর্ত্তন করতেন।

সম্রাট আকবর শিকারে বেরিয়েছেন। বৃন্দাবনে একটি নিবিড় জঙ্গলে সম্রাটের ছাউনি পড়েছে। সেদিন অনেক তোড়জোড় করা হয়েছিল ; কিন্তু কিছুতেই শিকার মিললো না। সারাদিন বনবাদাড় ভেঙ্গে বৈকালের দিকে অবসন্ন দেহ আর তারও চেয়ে অবসন্ন মন নিয়ে নিতান্তই নিরাশ হয়ে বাদশা যখন শিবিরে ফেরবার ব্যবস্থা করছেন, সেই সময় সহসা একটা প্রকাণ্ড বন্য হরিণ তাঁর নজরে পড়ে গেল। আর যায় কোথা ! আকবর শিকারের পশ্চাতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। হরিণও ছোটে যত, ঘোড়াও ছোটে তত। বাদশা ছুটেছেন ত ছুটেইছেন। কিন্তু হরিণকে কিছুতেই বাগে পাওয়া যাচ্ছে না। কাছাকাছি না পেলে তীর ছুঁড়বেনই বা কেমন করে ?

তাঁর অশ্ব ক্রমেই হাঁপিয়ে পড়ছে ; ফলে শিকারের সঙ্গে তাঁর দূরত্বের ব্যবধান ক্রমে বেড়েই চলছে। এদিকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে দেহ ভেঙ্গে পড়বার মত হয়েছে। কিন্তু শিকারের ঝোঁক বড় ঝোঁক

বাদশা একবার পশ্চাতের পানে তাকালেন।—তাঁর সঙ্গীদের কোন চিহ্ন নেই। তারা অনেকখানি পেছিয়ে পড়েছে। হয়ত বা তারা তাঁকে অনুসরণ করতে না পেরে ভুল করে ভিন্ন পথে চলে গেছে। গেছে যাক—তাতে ক্ষতি নেই!—একাই তিনি শিকারের পশ্চাতে ছুটবেন। কিন্তু এইভাবে ছুটলে হরিণ আর একটু পরেই দৃষ্টিসীমার বাইরে গিয়ে পড়বে। তখন ঘন জঙ্গলের মধ্যে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এমনি ধারা যখন অবস্থা, সেই সময় হঠাৎ আকবর দেখেন—দূরে—বহুদূরে তাঁর শিকারটি সহসা পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সম্রাট্ অবাক্ হয়ে গেলেন;—একি ব্যাপার! —হরিণটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল কেন? মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও সে যে রকম দ্রুত ছুটছিল—তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, সে এতটুকুও হাঁপিয়ে পড়েনি। অবাক্ হয়ে সম্রাট্ শিকারের পানে অশ্ব ছোটালেন। ব্যবধান ক্রমেই কমে আসছে; কিন্তু হরিণ নড়বার নামটি পর্য্যন্ত করে না। সম্রাট্ আরও নিকটে গেলেন—তবুও সেই একই ভাব।

আর একটু অগ্রসর হতেই হঠাৎ দূর থেকে অস্পষ্ট একটি সঙ্গীতের রেশ তাঁর কানে ভেসে এলো, কি অপূর্ব্ব সে সঙ্গীত!—সে যেন মানুষের সমস্ত চেতনাকে অভিভূত করে ফেলে; সে যেন মানুষের মনকে কোন্ এক স্বপ্নলোকে উধাও করে নিয়ে যায়।

আকবরের অশ্বটি কখন একসময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল—বাদশা তা জানতেও পারেন নি। হরিণের কথাও

তিনি ভুলে গেছেন। সমস্ত চেতনা যেন দূরাগত সেই সঙ্গীতের স্বপ্নঘোরে আচ্ছন্ন।

সহসা গান থেমে গেল। বাদশা যেন স্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ জেগে উঠলেন।—চেয়ে দেখেন, হরিণটিও হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠে প্রাণভয়ে আবার ছুটতে সুরু করে দিয়েছে। আকবর কিন্তু আর তাকে অনুসরণ করলেন না—সে প্রবৃত্তিও এখন তাঁর নেই। এতক্ষণে তিনি বুঝতে পারলেন—হরিণটি হঠাৎ অমন করে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল কেন।

কিন্তু কে সেই অপরিচিত গায়ক, যার গান মৃত্যুভয়ে ভীত বনের পশুকেও এমন মুগ্ধ করতে পারে? আকবর অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলেন। তারপর যেদিক থেকে গানের সুর ভেসে আসছিল, সেই দিক লক্ষ্য করে অগ্রসর হতে লাগলেন।

সরু আঁকাবাঁকা বন্যপথ। দুধারে নিবিড় ঘন জঙ্গল। বাদশা উন্মুখ হয়ে চলেছেন। গাছপালার আড়ালে ঐ না কার কুটীরের চালা দেখা যায়?—হ্যাঁ কুটীরইত বটে!

ছোট্ট একরত্তি ঘর।—যেমন জীর্ণ, তেমনি অপরিসর। তারি মধ্যে ছেঁড়া মাদুরে একটা হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে আছেন একটি দীর্ঘকায় পুরুষ। ঘরখানি এত ছোট যে, তাঁর পা দু'টির কতকাংশ দরজার বাইরে বেরিয়ে পড়েছে।

কুটীরের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াতেই এক জোড়া পা বাদশার চোখের সুমুখে জেগে উঠলো। এ দৃশ্য দেখতে সম্রাটের চোখ কোন দিন অভ্যস্ত নয়। আকবরশার চিত্ত ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো।

এই সময় কুটীরের ভিতর থেকে প্রশ্ন এলো—"কে ওখানে?"
উত্তর হোলো—"আমি দিল্লীর সম্রাট আকবরশা, তোমার গানে মুগ্ধ হয়ে এখানে এসেছি।"

আকবর মনে ভেবেছিলেন, একথা শোনবামাত্র কুটীরবাসী লোকটি নিশ্চয়ই তাঁর পাছ'টি শশব্যস্তে গুটিয়ে নেবেন। কিন্তু সে রকম কোন লক্ষণই দেখা গেল না।



আকবরশার বাদশাহী মেজাজ এইবার উদারা, মুদারা থেকে একবারে তারায় ঠেলে উঠলো। গম্ভীর স্বরে তিনি বলে উঠলেন—"পৈর উঠায়া কব্?"

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর এলো—"হাত উঠায়া যব্।"

আকবর স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এতবড় উত্তর আজ পর্য্যন্ত তিনি কারুর মুখ থেকে শোনেন নি। সত্যইত, সংসারের সমস্ত বাসনা-কামনা থেকে যে ব্যক্তি হাত উঠিয়ে

নিয়েছে, জগতের সবার সমানে পা তোলবার অধিকার ত একমাত্র তারই।) তার কাছে সম্রাট্ আর পথের ভিখারীতে প্রভেদ কোথায়?)

ইনিই হচ্ছেন তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামী।"

অনুশীলনী

১। গল্পটী নিজের ভাষায় লিখ।

২। 'হাত উঠায়া যব'—এই বাক্যের দ্বারা হরিদাস স্বামী কি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন?

৩। উদারা, মুদারা এবং তারা বলিতে কি বুঝ?

৪। শব্দার্থ লিখ :—বরপুত্র, অতিষ্ঠ, অপরিসর, অপ্রসন্ন, গুণগ্রাহী, আগ্রহাতিশয্য।



চন্দ্রগুপ্ত

(সিন্ধুনদের তীর ; সেকেন্দার শাহর শিবির)

সেকেন্দার।—কি সংবাদ আন্টিগোনাস্! এ কে?

আন্টিগোনাস্।—গুপ্তচর।

সেলুকস্।—সে কি!

আন্টি।—আমি দেখ্‌লাম যে, এই ব্যক্তি শিবিরের পাশে বসে' নির্জ্জনে শুষ্ক তালপত্রে কি লিখ্‌ছে। আমি দেখ্‌তে চাইলাম। পত্রখানি দেখাল। পড়তে পারলাম না।—তাই সম্রাটের কাছে নিয়ে এসেছি।

সেকে।—কি লিখ্‌ছিলে যুবক? সত্য বল।

চন্দ্রগুপ্ত।—সত্য বল্‌ব? ভারতবাসী মিথ্যা কথা বল্‌তে এখনও শেখেনি।

[সেকেন্দার একবার সেলুকসের প্রতি চাহিলেন, পরে চন্দ্রগুপ্তকে কহিলেন—]

উত্তম, বল কি লিখ্‌ছিলে!

চন্দ্রগুপ্ত।—আমি সম্রাটের বাহিনী-চালনা, ব্যূহ-রচনা-প্রণালী, সামরিক নিয়ম, এই সব মাসাবধি কাল ধরে শিখ্‌ছিলাম।

সেকে।—কার কাছে?

চন্দ্র।—এই সেনাপতির কাছে।

সেকে।—সত্য সেলুকস্?

সেলু।—সত্য।

সেকে।—[চন্দ্রগুপ্তকে] তারপর?

চন্দ্র।—তারপর গ্রীক্‌-সৈন্য কাল এস্থান পরিত্যাগ করে' যাবে শুনে, আমি যা শিখেছি, তা এই পত্রে লিখে নিচ্ছিলাম।

সেকে।—কি অভিপ্রায়ে?

চন্দ্র।—সেকেন্দার শাহর সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বার জন্য নয়।

সেকে।—তবে?

চন্দ্র।—শুনুন সম্রাট্‌! আমি মগধের রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত, আমার পিতার নাম মহাপদ্ম। আমার বৈমাত্র ভাই নন্দ সিংহাসন অধিকার করে' আমায় নির্ব্বাসিত করেছে। আমি তারই প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি।

সেকে।—তার পর?

চন্দ্র।—তারপর শুন্‌লাম ম্যাসিডন্‌-ভূপতির অদ্ভুত বিজয়-বার্ত্তা। অর্দ্ধেক এশিয়া পদতলে দলিত করে', নদ-নদী-গিরি দুর্ব্বার বিক্রমে অতিক্রম করে', শুন্‌লাম তিনি ভারতবর্ষে এসে' আর্য্যকুলরবি পুরুকে পরাজিত ক'রেছেন। হে সম্রাট্‌, আমার ইচ্ছা হ'ল যে, দেখে আসি—কি সে পরাক্রম, যার ভ্রুকুটি দেখে' সমস্ত এশিয়া পদতলে লুটিয়ে পড়ে; কোথায় সে শক্তি লুক্কায়িত

আছে, আর্য্যের মহাবীর্য্যও যার সংঘাতে বিচলিত হ'য়েছে। তাই এখানে এসে সেনাপতির কাছে শিক্ষা কর্‌ছিলাম। আমার ইচ্ছা, শুদ্ধ আমার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করা। এইমাত্র।

[সেকেন্দার সেলুকসের পানে চাহিলেন]

সেলুকস্।—আমি এইরূপ বুঝি নাই। যুবকের চেহারা, কথাবার্ত্তা আমার মিষ্ট লাগ্‌ত। আমি সরলভাবে গ্রীক্-সামরিক-প্রথা সম্বন্ধে যুবকের সঙ্গে আলোচনা করেছি। বুঝি নাই যে এ বিশ্বাসঘাতক।

আন্টিগোনাস্।—কে বিশ্বাসসাতক ?

সেলু।—এই যুবক।

আন্টিগোনাস্।—এই যুবক, না তুমি ?

সেলু।—আন্টিগোনাস্! আমার বয়স না মানো, পদবী মেনে চলো।

আন্টি।—জানি, তুমি গ্রীক্-সেনাপতি, তা সত্ত্বেও তুমি বিশ্বাসঘাতক।

সেলুকস্।—আন্টিগোনাস্! [তরবারি বাহির করিলেন]

[আন্টিগোনাস্ ক্ষিপ্রতর হস্তে তরবারি বাহির করিয়া সেলুকসের শির লক্ষ্য করিয়া ক্ষেপণ করিলেন। ততোধিক ক্ষিপ্রহস্তে চন্দ্রগুপ্ত নিজ তরবারি বাহির করিয়া সে আঘাত নিবারণ করিলেন। আন্টিগোনাস্ তাঁহাকে ছাড়িয়া চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করিলেন।]

সেকেন্দার।—নিরস্ত হও!

[সেই মুহূর্ত্তেই আন্টিগোনাসের তরবারি চন্দ্রগুপ্তের তরবারির আঘাতে ভূপতিত হইল।]



সূর্য্যের কথা

সূর্য্যের সম্বন্ধে কোনো কথা বলিতে গেলে তোমরা বোধ করি রাগ করিবে। বলিবে, আমরা কি জানি না যে সূর্য্য পৃথিবী হইতে অনেক দূরে, সূর্য্য পৃথিবী হইতে অনেক বড়ো ইত্যাদি। কিন্তু একটু ধৈর্য্য ধরিয়া দেখিবে, সব কথা নিতান্ত পুরাতন ঠেকিবে না।

সকলেই জানে বটে যে, সূর্য্য পৃথিবী হইতে সাড়ে চার কোটি ক্রোশের চেয়েও বেশি দূরে আছে। কিন্তু সে কেবল জানাই সার। এক শ, দুই শ ক্রোশ যে কতখানি তাহাই আমাদের মনে ভালো আয়ত্ত হয় না তো চার কোটি ক্রোশ। এখান হইতে সূর্য্যে পৌঁছিতে কতক্ষণ লাগে তাহার একটা উদাহরণ দিলে তবু কতকটা বুঝা যাইবে। মনে করো, যে-রেলগাড়ি ঘণ্টা পিছু ৩০ ক্রোশ করিয়া চলে অর্থাৎ দুই মিনিটে এক ক্রোশ যায়, এইরূপ গাড়িতে চড়িয়া তুমি যদি ১৭১ বৎসর আগে পৃথিবী হইতে যাত্রা করিতে, তবে আজ তুমি সূর্য্যের নিকট যাইতে পারিতে। মোগল-রাজত্বের সময় ঔরঞ্জীবের প্রপৌত্র ফেরাক্‌শিয়ার যখন সবে দিল্লীর রাজা হইয়াছেন, তখন যদি রেলগাড়িতে চড়িতে, তবে লর্ড ডফ্‌রিন যেই ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন তুমিও দিনরাত্রি ছুটিয়া সূর্য্যের কাছাকাছি ষ্টেশনে গিয়া

পৌঁছিতে। ইতিমধ্যে ক্রমান্বয়ে মহম্মদ শা, আমেদ শা, দ্বিতীয় আলমগীর দিল্লীর বাদশা হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতাপ বাড়িল। মহারাষ্ট্রীয়দের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ হইল। ভারতবর্ষে কোম্পানির মুল্লুক ব্যাপ্ত হইল। ভারতবর্ষ কোম্পানির হাত হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে আসিল। অনেক লাট-সাহেবের পর লর্ড রিপন্ আসিলেন। তিনি চলিয়া গেলেন, লর্ড ডফ্‌রিন আসিলেন।

সূর্য্যের কাছে গেলে তাহাকে কতবড়ো দেখিতে? আনাক্সাগোরস নামক গ্রীস দেশের একজন পণ্ডিত পিলপনিসস প্রদেশ অপেক্ষা সূর্য্যকে বৃহৎ বলায় গ্রীস দেশের লোকেরা তাঁহাকে উপহাস করিয়াছিল। পিলপনিসস গ্রীস দেশের একটি অংশ। কিন্তু তাহারা যদি শুনিত যে সূর্য্য সমস্ত গ্রীস দেশ অপেক্ষা কেন, পৃথিবী অপেক্ষা দশ লক্ষগুণ বড়ো তাহা হইলে তাহারা না জানি কী বলিত। পৃথিবী এত বড়ো যে আমাদের বাংলা দেশ তাহার উপরে ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো। একটি দ্রুতগামী রেলগাড়িতে উঠিলে পৃথিবীর চারিধারে ঘুরিতে একমাস কাল লাগে। আমাদের দেশ পৃথিবীর নিকট এক বিন্দুর ন্যায়, কিন্তু সূর্য্যের নিকট পৃথিবীর আয়তন কিছুই নহে। কারণ পৃথিবীর ব্যাস চার হাজার ক্রোশ এবং সূর্য্যের ব্যাস্ চার লক্ষ চব্বিশ হাজার ক্রোশ। সূর্য্যকে এবং পৃথিবীকে যদি তরমুজের মতো মাঝামাঝি দুইখানি করিয়া কাটা যায় ও পৃথিবীর কাটা দিকটা সূর্য্যের কাটা দিকের উপর রাখা যায়, তাহা হইলে এমন ১০৬ খানা পৃথিবী সার বাঁধিয়া রাখিলে তবে সূর্য্যের ব্যাসরেখা পূর্ণ হয়। সূর্য্যের সমস্ত আয়তন

কত বড়ো যদি জানিতে চাও, তাহা হইলে তাহাকে একটি ফাঁপা গোলার মতো মনে করো এবং তারপর দেখো কতগুলি পৃথিবী হইলে তাহার পেট ভরে। দশ লক্ষ একত্রিশ হাজারটা পৃথিবী ইহার মধ্যে অক্লেশে ধরিতে পারে। আমাদের পেটে এতগুলো তিল ধরে কিনা সন্দেহ।

সূর্য্য যে কত বড়ো তাহা বুঝিলাম। কিন্তু ইহার আলোক ও উত্তাপের পরিমাণ যে কত তাহা মনে ধারণা করা এক প্রকার অসম্ভব। এক টুক্‌রা চা-খড়ি অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনের আলো জ্বালাইয়া উত্তপ্ত করিলে তাহা এক প্রকার কৃত্রিম আলো প্রদান করে। তাহা এত প্রখর যে তাহার দিকে চক্ষু রাখা যায় না। ইহার আলোক সূর্য্যকিরণের মতো অতি শুভ্র। তাই বলিয়া কি তুমি মনে করো যে সূর্য্যের মতো বড়ো একটা চা-খড়ি আনিয়া তাহাকে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়া জ্বালাইলেই সূর্য্যের সমান আলোক ও উত্তাপ পাওয়া যাইবে। তাহা নহে, সূর্য্য অপেক্ষা ১৪৬ গুণ বড়ো অর্থাৎ পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দকোটি গুণ বড়ো একখানা চা-খড়ি আনিতে হইবে, তবে একটা কৃত্রিম সূর্য্য নির্ম্মাণ করিতে পারা যায়। মনে করিয়া দেখো সূর্য্যের সমস্ত কিরণের মধ্যে কত অল্পটুকুই আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর উপর পড়িতেছে, অথচ বৈশাখ মাসে ইহাই আমাদের কাছে কী প্রখর বোধ হয়। ঘরের মধ্যে যে প্রদীপ জ্বলিতেছে তাহার আলোক চারিধারে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ক্ষুদ্র এক সরিষা আনিয়া প্রদীপের কিছু দূরে ধরিলে কতটুকু আলো সেই সরিষার উপর পড়ে। তুলনা করিলে আমাদের পৃথিবীর উপরেও

ততটুকুই সূর্য্যের আলো পড়ে এবং তাহাতেই পৃথিবীর সমস্ত কার্য্য চলিয়া যায়। সূর্য্য-কিরণের প্রখরতা যদি পরীক্ষা করিতে চাও তাহা হইলে আতশ কাঁচের সাহায্যে সহজে করিতে পারো। আতশ কাঁচ সূর্য্যের সম্মুখে ধরিলে, তাহার কিরণ সেই কাঁচের মধ্য দিয়া বাহিরে আসিয়া বিন্দু আকারে যেখানে মিলিত হয়, সেই জায়গায় একটুক্‌রা কাগজ রাখিলে তাহা জ্বলিয়া উঠে। সার্‌ জন হর্শেল বলেন যে, আফ্রিকার দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপে সূর্য্যের উত্তাপ এত অধিক যে, তিনি একটি কাঁচের বাক্সে মাংস ও ডিম রাখিয়া কেবলমাত্র রৌদ্রের সাহায্যে তাহা পাক করিয়াছিলেন। তবু সূর্য্য-কিরণের সমস্ত দৌরাত্ম্য আমাদিগকে সহিতে হয় না। সূর্য্যের উত্তাপে জলের কণা বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে, তাহাতে করিয়া বাতাস অনেকটা ঠাণ্ডা রাখে, তাহা না হইলে সূর্য্য-কিরণের জ্বালায় পৃথিবীতে আমাদের টেকা দায় হইত।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুশীলনী

১। রচনাটি পড়িয়া সূর্য্য সম্বন্ধে তোমার যে ধারণা হয়, তাহা নিজের ভাষায় লিখ।

মন্দিরেতে  বাঘের দেখা

—যে জায়গায় বাঘ আছে বলে খবর পেয়েছিলাম, সেখানে অনেক খোঁজখুঁজি করেও বাঘের দেখা মিলল না। লোকটির 'কথায়' এতদূর এসে হতাশ হওয়াতে, মেজাজ যে কি রকম বিশ্রী হয়েছিল তা বোধ হয় বুঝতে পারছ। কি করবো ভাবছি, এমন সময়ে মাহুত দূরের একটা গাছে দাগ দেখিয়ে বললে, "ওটা নিশ্চয় বাঘের থাবার আঁচড়।" দাগটা অনেক উঁচুতে বলে ওর কথায় ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাই মাহুতের কথাটা ঠিক কি না দেখবার জন্য আমি হাতী থেকে নেমে, পিস্তল হাতে, ঐ গাছটার দিকে এগোতে থাকি। কাছাকাছি বাঘ থাকতেও পারে। হাতী থেকে নামলে বিপদের সম্ভাবনা; তবুও নামলাম।

—এক রকম বাধ্য হয়েই নামলাম, কেন না সামনেই একটা মজা পুকুর জঙ্গলে ভরা। তবু কে জানে, যদি পাঁক থাকে, আর তাতে হাতী পুঁতে যায়। পুকুরের ধার দিয়ে যাওয়াও মুস্কিল। চারিদিকের বাঁশঝাড়ে লতা-পাতা জড়িয়ে এমন অবস্থা হয়েছে যে হাতী তার মাঝ দিয়ে এগোতে পারে না। একথাও ভাবলাম যে, বাঘ কাছাকাছি থাকলে কি আর এত তাড়াতেও বেরুতো না? আমি হামাগুড়ি দিয়ে কোনও রকমে গাছটার কাছে গিয়ে দেখি, গাছে সত্যই আঁচড়ানোর দাগ। আঁচড়ানোর

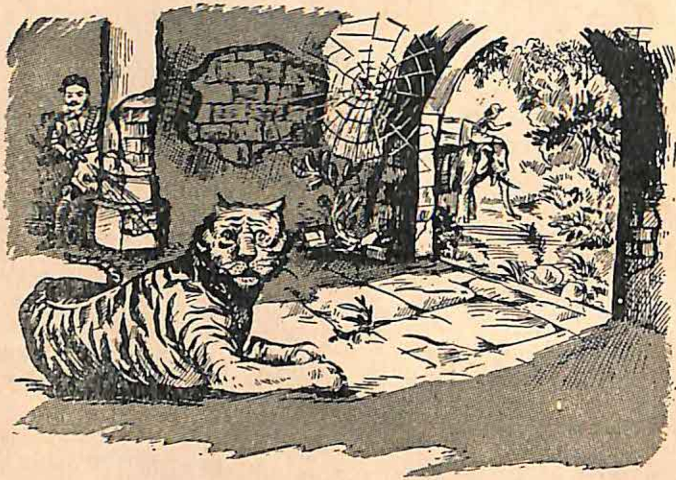
দাগ থেকে রস গড়িয়ে পড়তে দেখে মনে হলো, খানিক আগেই বাঘটা হয়ত ওখানে এসেছিল। চারিদিকে বেশ ভাল করে দেখতে দেখতে বাঘের পায়ের দাগ দেখতে পেলাম—বেশ বড় আর খুব স্পষ্ট। বাঘটা যে জলের ধারে গিয়েছিল, তার চিহ্নও দেখতে পেলাম। দেখে ভয়ে আমার ঘাম ছুটলো। আমি চেঁচিয়ে ভাস্করকে জানিয়ে দিলাম যে, বাঘ কাছাকাছি আছে এতে কোনও ভুল নেই।

—খুব সন্তর্পণে হাঁটু ও হাতে ভর দিয়ে, কোথাও বা লতাপাতার বাঁধন ছিঁড়ে, বাঁশঝাড়ের ভিতর ঢুকতে থাকি। যত এগোই তত বেশী অন্ধকার। মাঝে মাঝে ভাস্কর খবর নেয়, আমিও সাড়া দিতে থাকি। একবার এমনি সাড়া দেবার পর আওয়াজে মনে হলো, কী একটা যেন আমার সামনেই ঝোপের মাঝে পথ করে চলেছে। বাঘ হতে পারে, একথা মনেই হলো না। বাঘ আগে আগে গেলে পথ করেই যেত,—আমাকে এত কষ্ট করে ঢুকতে হতো না।

—তবে কী হতে পারে? খানিক আগেই নদীর ওপারের লোকজনের কাছে এদিককার ভাঙ্গা মন্দিরের কত গল্পই শুনে এসেছি। মন্দিরের নীচে নাকি যখের ধন পোঁতা আছে। ভূত-প্রেত এদিকে আছে বলে জনরব। আমার শরীর হিম হতে লাগলো, আর বুক ধড়ফড় করতে লাগলো।

—ধূলো কাদা মেখে, ঝোপ পার হয়ে, একটা ভাঙ্গা মন্দিরের সামনে পৌঁছলাম। চারিদিকে ইটের স্তূপ। মন্দিরের উইয়ে খাওয়া দরজা আধভেজান অবস্থায় ঝুলছে। ভেতরে ঢুকতে যেন

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। একটা শেয়াল আর একটা গোসাপ দেওয়ালের ভাঙ্গা জায়গাটা দিয়ে পালালো। কতকগুলো চামচিকে ডানা ঝাপটা দিয়ে খানিক উড়ে, আবার অন্ধকারে লুকালো। আমি অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে মাকড়সার জালের মাঝ দিয়ে আরও ভেতরে গেলাম্ ;—কেমন যেন রোক্ চেপে গেছে তখন। সামনের দরদালান পার হয়ে ভেতরে ঢুকলাম।



সেখানে আরও অন্ধকার। চামচিকেগুলো আমার মাথার উপর ক্রমাগত ঘুরপাক দিতে লাগলো। তার প্রতিধ্বনির বিশ্রী আওয়াজে কেমন যেন ভয় করতে লাগলো।

—অন্ধকার চোখে সয়ে গেলে দেখলাম, ভাঙ্গা ছাদ ও দেওয়ালে এমন ভাবে আগাছা জন্মেছে যে, হঠাৎ দেখলে সাপ বলে মনে হয়। প্রথমে অনেক চেষ্টা করেও দূরে অন্ধকারের মাঝে কিছুই চোখে পড়লো না। খানিক এদিক ওদিক তাকাতে

তাকাতে দেখি দূরে কালোর বুকে কী যেন জ্বলজ্বল করছে। মনে হলো হীরেই বুঝি। অন্ধকারে এগোনো মুস্কিল, তাই ভাস্করকে চেঁচিয়ে বললাম, একজন লোককে দিয়ে দেশলাই পাঠিয়ে দিতে। আমার কথার প্রতিধ্বনি হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, যেন একটা রাগী বেড়াল ফ্যাস্ ফ্যাস্ করে উঠলো। শব্দটা সাপের হিস্ হিস্ বা চামচিকের ডানার আওয়াজ ভেবে ও নিয়ে আর মাথা ঘামালাম না। দূরে অন্ধকারে আবার তাকালাম। দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। একটা নয়, দুটো জিনিস ঠিক হীরকের মত জ্বলজ্বল করছে। আলো কম বেশী পড়ায় যেন মাঝে মাঝে উজ্জ্বলতাও কম-বেশী হচ্ছিল।

অজানা জায়গায় অন্ধের চলার মত সামনে হাত বাড়িয়ে, হাতড়াতে হাতড়াতে আরও এগিয়ে গেলাম। এমন সময়ে এক ভীষণ গর্জ্জনে দেওয়ালগুলো কেঁপে উঠলো। হীরের মত জিনিস দুটো আগুনের ভাঁটার মত জ্বলতে লাগলো। বুঝতে আর বাকী রইল না, ওদু'টো কী। কলে পড়ার মত বাঘের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছি। আর কতক্ষণই বা ? একথা মনে হতেই জীবনের ছোট বড় কত ঘটনাই চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

বাঘটা মন্দিরের ভেতরে লুকিয়ে ছিল। হয়ত ভূরিভোজের পর ঝিমুচ্ছিল। আমি আসতে ও ভেবেছে, আমি ওকে আক্রমণ করতে এসেছি, কাজেই ও হাঁক দিয়ে এগিয়ে আসা ছাড়া আর কি করতে পারে ? আমি চোখের নিমেষে চট করে মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা আমায় ডিঙ্গিয়ে একলাফে চলে গেল। আমি যেন মন্ত্রচালিতের

মত উঠে পড়ে, ছুটে গেলাম একটা থামের পিছনে। তখন বাঘটা গর্জ্জন করতে করতে সারা ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু প্রাণের আশা নেই ভেবে একরকম মরিয়া হয়েই উঠেছি। আমি তো জানছি, আমি বাঘের মুঠোর ভেতরে,—একটু শব্দ করলেই ও আমায় শেষ করে দেবে। ঘুরে ফিরে এসে, এক সময় বাঘটা শুয়ে পড়লো,—ওর চোখটা কিন্তু রইল দরজার দিকে। ওর ধারণা হয়েছিল বোধ হয় যে, শত্রু আছে বাইরে এবং সে আসবে ঐ দরজা দিয়েই। আমি ভাবলাম এই-ই সুযোগ। আর সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে ঘোড়াটা টিপে দিলাম। গুলির আওয়াজে বাঘটা এক মর্ম্মভেদী হাঁক দিয়ে মাথাটা ঘুরিয়ে নিলে। আমি তবুও পর পর বার কয়েক গুলি করলাম। তাতেই ও মরে গেল।

—বিবেকানন্দ পাল

অনুশীলনী

১। গল্পটি নিজের ভাষায় লিখ।

২। নিজের ভাষায় ভাঙ্গা মন্দিরটির বর্ণনা দাও।



স্কুলজীবন

তখন ১৯০২ সালের জানুয়ারি মাস। আমার পাঁচ বছর পূর্ণ হতে তখনো কিছু বাকি, এমনি সময়ে একদিন শুনলাম, আমি নাকি স্কুলে ভরতি হব। খবর পেয়ে আমি তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। দিনের পর দিন চোখের উপর দেখতাম দাদা দিদিরা সেজেগুজে স্কুলে যেত—ছোটো বলে আমিই শুধু বাড়িতে পড়ে থাকতাম—এতে মেজাজ বিগড়ে যেত। কাজেই স্কুলে যাবার নামে আমি নেচে উঠলাম।

যেদিন প্রথম স্কুলে যাবার কথা, সেদিনটির কথা আজও আমার মনে আছে। শেষটায় আমিও বড়দের মতো স্কুলে যেতে পারবো, শুধু ছুটির দিন ছাড়া বাড়িতে থাক্‌বো না। স্কুল বসত ঠিক দশটায়, কাজেই দশটার একটু আগেই আমাদের রওনা হতে হবে। আমারই বয়সী আমার দুজন কাকারও সেদিন ভরতি হবার কথা ছিল। সবাই প্রস্তুত হয়ে নিয়ে গাড়িতে ওঠবার জন্য মাত্র ছুট লাগিয়েছি, এমন সময়ে পা পিছলে এক বিশ্রীরকম আছাড় খেলাম। মাথায় চোট্ লেগেছিল, কাজেই ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে সেদিনকার মতো আমাকে শয্যাশায়ী থাকতে হল। আমার কাকাদের ভাগ্য ছিল ভালো, ওরা দিব্যি স্কুলে চলে গেল, আর আমি ভগ্নহৃদয়ে চোখ বুজে পড়ে রইলাম।

পরের দিন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

আমাদের স্কুলটা ছিল মিশনারিদের, আর এখানকার বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীই ছিল য়ুরোপীয় কিংবা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। ভারতীয়দের জন্য গোনাগুন্তি কয়েকটা (শতকরা বোধ হয় ১৫টা) সীট ছিল। আমার অন্য ভাইবোনেরাও এই স্কুলেই পড়ত, কাজেই আমিও এখানে ভরতি হলাম। বেছে বেছে এই স্কুলেই আমাদের কেন ভরতি করা হয়েছিল জানিনে, হয়তো অন্য সব স্কুলের চাইতে এখানে ইংরিজিটা তাড়াতাড়ি এবং ভালো শেখা যেত বলেই;—আর তখনকার দিনে ইংরিজি-জ্ঞানের বিশেষ কদরও ছিল। এখনো মনে আছে, ভরতি হবার সময়ে আমার ইংরিজি-বিদ্যের দৌড় বর্ণ পরিচয়ের বেশি ছিল না। একটাও ইংরিজি কথা না জেনেও আমি কি করে যে চালিয়ে নিতাম এখন ভাবলে আশ্চর্য্য মনে হয়। প্রথম প্রথম ইংরিজি বলতে গিয়ে যে কি বিভ্রাট হত ভাবলে হাসি পায়। একটা ঘটনা মনে পড়ে। একবার আমাদের সকলের হাতে একটি করে শ্লেট-পেন্‌সিল দিয়ে আমাদের শিক্ষয়িত্রী বললেন সেগুলোকে ছুঁচোলো করে নিতে। আমি দেখলাম কাকার চাইতে আমার পেন্‌সিলটা বেশি ছুঁচোলো হয়েছে—অমনি ইংরিজিতে শিক্ষয়িত্রীকে সেটা জানিয়ে দেবার জন্য বললাম—"রমেন্দ্র মোট, আই শোর" বলেই মনে মনে নিজের ইংরিজি-জ্ঞানের তারিফ না করে পারলাম না।

আমাদের পাঠ্যতালিকা এমনভাবে তৈরী হত যাতে মনেপ্রাণে আমরা ইংরেজ হয়ে উঠতে পারি। গ্রেটবৃটেনের ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধে আমার যতখানি জ্ঞান ছিল, ভারতবর্ষ সম্পর্কে

তার সিকি ভাগও ছিল কিনা সন্দেহ। ভারতীয় নামও আমরা উচ্চারণ করতাম বিদেশীদের মতো বিকৃতভাবে। ল্যাটিন শব্দরূপ মুখস্থ করতে করতে আমরা গলদ্ঘর্ম হয়ে উঠতাম, অথচ পি. ই. স্কুল ছাড়বার আগে সংস্কৃত ধাতুরূপ সম্বন্ধে আমাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। গানের ক্লাসে আমরা শিখতাম ডো রে মি ফা; সা রে গা মা নয়। পাঠ্য বইয়ে পড়তাম ওদেশের ইতিহাসের গল্প, রূপকথা—নিজের দেশের ছিটেফোঁটাও তাতে থাকত না। বলাই বাহুল্য দেশী কোনো ভাষাই সেখানে শেখানো হত না, আমরাও দেশী স্কুলে ঢোকবার আগে পর্য্যন্ত মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়েই বেরিয়েছি। ১৯০৯ সালের জানুয়ারি মাসে আমি যখন কটকের র‍্যাভেন্‌শ কলেজিয়েট স্কুলে ভরতি হলাম, আমার মনের একটা বড় রকমের পরিবর্ত্তন ঘটল।

এবার আমাকে আর ইনফ্যান্ট্ ক্লাসে ভরতি হতে হল না, আমি ভরতি হলাম গিয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্ররা নিজেদের উঁচু ক্লাসের ছাত্র বলেই মনে করত এবং বেশ একটা ভারিক্কী চালে চলাফেরা করত। আমিও তাদের দলেই ছিলাম। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমাকে একেবারে কাবু করে রেখেছিল। এই স্কুলে ভরতি হবার আগে আমি বাঙলা এক বর্ণও পড়িনি। এদিকে আমার সহপাঠীরা সকলেই বাঙলায় বেশ পাকা ছিল। মনে পড়ে প্রথম দিন আমি 'গোরু' (না ঘোড়া ?) সম্বন্ধে বাঙলায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, আর সেই রচনা নিয়ে ক্লাসে সে কি হাসাহাসি! ব্যাকরণ বা বানান সব কিছুতেই আমি দিগ্‌গজ ছিলাম। শিক্ষকমশাই যখন টীকাটিপ্পনী সহকারে

ক্লাসের সকলকে আমার অপূর্ব্ব রচনাখানি পড়ে শোনালেন, তখন চারিদিকে এমন হাসির ধূম পড়ে গেল যে লজ্জায় আমি প্রায় মাটিতে মিশে গেলাম। পড়াশোনার জন্য এভাবে আগে কখনো আমাকে বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়নি, তার উপরে আমার আত্মসম্মানজ্ঞানও হালে একটু বেড়েছিল, কাজেই আমার অবস্থাটা কী হয়েছিল সহজেই বুঝতে পারছ। এরপর বহুদিন পর্য্যন্ত বাঙলা ক্লাসের নামেই আমার জ্বর আসত। কিন্তু ভেতরে ভেতরে রাগে দুঃখে জ্বলে গেলেও প্রথম প্রথম টিটকিরি সহ্য না করে উপায় ছিল না। মনে মনে তখন থেকেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, বাঙলা আমি শিখবই। ধীরে ধীরে বাঙলায় বেশ উন্নতি করতে লাগলাম এবং বাৎসরিক পরীক্ষায় যখন বাঙলায় আমি সবচেয়ে বেশ নম্বর পেলাম, তখন আমার আনন্দ দেখে কে?

—সুভাষচন্দ্র বসু

অনুশীলনী

১। মিশনারি-স্কুলে পড়ার সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র কি বলিয়াছেন?

২। র‍্যাভেন্‌শ কলেজিয়েট স্কুলে ভরতি হইয়া প্রথম প্রথম সুভাষচন্দ্রেকে অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল কেন?

পূর্ব্বের কাছে পশ্চিমের ঋণ

তোমরা জান যে, ইউরোপের লোকেরা সাধারণতঃ এশিয়া এবং উত্তর-আফ্রিকার লোকদের পূর্ব্বদেশের অধিবাসী বলিয়া থাকেন। তাঁহারা নিজেরা হইলেন পশ্চিমদেশের লোক। এই পূর্ব্ব-জগতের সভ্যতার সহিত পশ্চিম-জগতের সভ্যতার অনেক পার্থক্য আছে। কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পশ্চিমের লোকেরা মনে করিতেন, সভ্যতার যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ্, তাহা পশ্চিম-জগতেরই দান। কিন্তু পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে আজকাল প্রমাণিত হইয়াছে যে, মানবসভ্যতার অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ পশ্চিম-জগৎ পূর্ব্ব-জগতের নিকট হইতেই পাইয়াছে। আজকাল পশ্চিম-জগৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানে পূর্ব্ব-জগৎকে অনেকখানি আগাইয়া চলিয়াছে, সত্য, কিন্তু এমন একদিন ছিল, যখন পশ্চিম এই পূর্ব্ব-জগতের নিকট হইতেই নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিল। এখন দেখা যাক্, পূর্ব্ব-জগতের নিকট হইতে পশ্চিম-জগৎ এবং মানবসভ্যতা কি কি লাভ করিয়াছে।

তোমরা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, মানব-সভ্যতার মূলে রহিয়াছে অক্ষর-সৃষ্টি। আমরা অক্ষরের সাহায্যে মনের কথা প্রকাশ করিয়া বই লিখিতে পারি, বিজ্ঞান আলোচনা করিতে পারি, এবং আরও কত কি করিতে পারি।—এইখানেই মানুষের সহিত অন্যান্য প্রাণীর প্রধান পার্থক্য। মানবসভ্যতার

কীর্ত্তি এই অক্ষর-সৃষ্টি সর্ব্বপ্রথম কোথায় হইয়াছিল জান? আমাদের এই পূর্ব্ব-জগতে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে অক্ষর-সৃষ্টি হইয়াছিল মিশরে, আবার কাহারও কাহারও মতে আসিরিয়াতে। বলা বাহুল্য এই দুই স্থানই পূর্ব্ব-জগতে অবস্থিত।

ফিনিসিয়ার বণিক্‌রা মিশরবাসীদের নিকট হইতে এই অক্ষর শেখেন। আবার তাহাদের নিকট হইতে পশ্চিম-জগতের গ্রীকরা শেখেন। এইভাবে ক্রমশঃ পশ্চিম-জগতে অক্ষরের প্রচলন হয়।

তাহার পর যে কাগজের উপর আমরা লিখি, তাহাও পূর্ব্ব-জগতের দান। চীনদেশের লোকেরাই সর্ব্বপ্রথম কাগজ প্রস্তুত করিতে শেখেন এবং চীনদেশ হইতেই জগতের অন্যান্য দেশ কাগজ ব্যবহার করিতে শেখে।

তাহার পর আসে মুদ্রাযন্ত্রের কথা। ছোট ছোট স্বতন্ত্র হরফ পাশাপাশি সাজাইয়া বই ছাপাইবার রীতি পশ্চিম-জগতে মাত্র পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রচলিত হইয়াছে। তাহার বহু পূর্ব্বে চীনদেশে উক্ত প্রণালীতে ছাপার কাজ হইত।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং আবিষ্কারক স্যার অরেল্‌ষ্টাইন্ মধ্য-এশিয়ার মরুভূমির তলদেশ হইতে কতকগুলি প্রাচীন ছাপান চীনা কাগজপত্র উদ্ধার করিয়াছেন। সৌভাগ্যবশতঃ চারিখানি ছাপান কাগজে তারিখ পর্য্যন্ত দেওয়া আছে। ইহার মধ্যে যেটির তারিখ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, সেটি ৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের।

তাহার পর অঙ্কের জন্মও আমাদের এই পূর্ব্ব-জগতে। ১, ২ প্রভৃতি অঙ্কগুলির জন্ম হইয়াছিল ভারতবর্ষে, এবং ইংরেজীতে

যাহাকে বলা হয় 'ডেসিম্যাল ফ্র্যাক্‌সন' (decimal fraction) এবং বাংলায় যাহাকে বলি দশমিক ভগ্নাংশ, তাহাও সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয়। 'আল্‌জেব্‌রা' অর্থাৎ বীজগণিতও আমাদের দেশে প্রথম জন্মলাভ করে। আমাদের নিকট হইতে আরবেরা শেখেন; তারপর আরবদের নিকট হইতে ইউরোপের লোকেরা শেখেন।

আর্য্যভট্টকে সাধারণতঃ উচ্চ বীজগণিতের জন্মদাতা বলা হয়। ইনি ৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে পাটলিপুত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত খলিফা মনসুরের রাজত্বকালে (৭৩৩ খ্রীঃ অঃ) সিন্ধুদেশ হইতে অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত কয়েকজন হিন্দু আরবের রাজসভায় নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। আরবদের মধ্যে সেই সময় মুসা নামে অঙ্কশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। মুসার বীজগণিত হইতেই ইউরোপ সর্ব্বপ্রথম বীজগণিতে দীক্ষালাভ করে।

জ্যামিতির জন্মস্থান লইয়া দুইটি মত আছে। কেহ বলেন, প্রাচীন ভারতবর্ষে জ্যামিতির প্রথম জন্ম হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন মিশরদেশই জ্যামিতির আদি জন্মস্থান। এই দুইটি মতের যেটিই সত্য হউক, একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, জ্যামিতির উদ্ভব হইয়াছিল প্রথম এই প্রাচ্য জগতে।

জ্যোতিষ সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞান পশ্চিম পূর্ব্ব-জগতের নিকট হইতে লাভ করিয়াছে। আজকাল সভ্যজগতের সর্ব্বত্র সৌরবর্ষ প্রচলিত; অর্থাৎ আজকাল ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় বৎসর ধরা হয়।

বৈদিক কালেও হিন্দুরা সৌরবর্ষ হিসাবে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় বৎসর গুণিতেন—যাহা আজকাল আমরা করিয়া থাকি। এই সৌরবৎসর যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিশরে আবিষ্কৃত হয়।

আজকাল টাকা-পয়সা প্রভৃতি ধাতু-মুদ্রা না হইলে ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি অচল হইয়া যায়। কিন্তু ধাতু-মুদ্রার প্রচলন চিরকাল ছিল না। এক সময় মানুষ বিনিময়-পদ্ধতিতে বেচা-কেনা করিত। যাহার গোরু আছে, সে গোরুর বদলে অপরের নিকট হইতে ধান লইত। যাহার ধান আছে, সে ধান দিয়া যাহার কাছে কাপড় আছে, তাহার কাছ হইতে কাপড় লইত। ইহাকেই বলে বিনিময়-পদ্ধতি। এই বিনিময়-পদ্ধতির অসুবিধা অনেক। তাই মানুষ ক্রমে মুদ্রা সৃষ্টি করিয়া বসিল। মধ্য-এশিয়ার লিডিয়া নামক দেশের বণিকরাই সর্ব্বপ্রথম মুদ্রা প্রস্তুত করেন। লিডিয়ার বণিক্‌দের নিকট হইতেই গ্রীকরা মুদ্রা ব্যবহার করিতে শেখেন।

আজকালকার নিত্য-প্রয়োজনের অনেক ছোটখাট জিনিস প্রথম পূর্ব্বদেশ হইতে পশ্চিমে গিয়াছে। এই যে ছাতা, সারা জগতে আজকাল যাহার ব্যবহার চলিতেছে, ইহাও পূর্ব্ব হইতেই পশ্চিমে যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে একজন ইংরেজ চীনদেশ হইতে একটা ছাতা ইংলণ্ডে লইয়া আসেন। যেদিন ছাতা মাথায় দিয়া ভদ্রলোক পথে বাহির হইয়াছিলেন, সেদিন তাঁহার কি দুর্দ্দশা! ছেলে বুড়ো সকলেই দলে দলে ভদ্রলোকের পিছু লইয়াছিল—যেন রাস্তায় কোন সং বাহির হইয়াছে!

চা না হইলে আজকাল আমাদের একদিনও চলে না। এই চা-ও চীনদেশ হইতে প্রথম পশ্চিমে যায়।

এমনই ভাবে যুগের পর যুগ ধরিয়া পশ্চিম পূর্ব্ব-জগতের নিকট হইতে অনেক জিনিস শিখিয়াছে।

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (পরিবর্ত্তিত)

অনুশীলনী

১। চীনদেশে প্রথম কোন্ কোন্ জিনিস আবিষ্কৃত হইয়াছিল ?

২। 'বিনিময়-পদ্ধতি' কাহাকে বলে ?

৩। আমাদের নিত্য-প্রয়োজনের কোন্ কোন্ জিনিস পূর্ব্ব-জগতের দান ?

৪। ভারতবর্ষ সর্ব্বপ্রথম কি কি জিনিস আবিষ্কার করিয়াছিল ?

বৃত্রাসুর বধ



বিশ্বকর্ম্মার ছিল এক পুত্র,—তাহার তিনটি মাথা, নাম তাই ত্রিশিরা। ইন্দ্রের সহিত এই ত্রিশিরার হইল বিবাদ। ফলে ইন্দ্রের হস্তে ত্রিশিরার মৃত্যু হইল। পুত্রহন্তা ইন্দ্রের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বিশ্বকর্ম্মা এক যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। ক্রোধে ইন্দ্রের সর্ব্বনাশ কামনা করিয়া যজ্ঞে আহুতি দেওয়া মাত্রই সেই যজ্ঞের ধূম হইতে এক ঘোর কৃষ্ণবর্ণের অসুর উঠিল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন,—হে ইন্দ্রের শত্রু, আমার তপস্যার বলে তুমি বৃদ্ধি পাও!

দেখিতে দেখিতে অসুর বাড়িয়া উঠিল। তাহার কালো বিশাল দেহ সমস্ত গগন ছাইয়া ফেলিল। সমস্ত জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অসুরের নাম হইল বৃত্র।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন,—বৃত্র, ইন্দ্র আমার পুত্রকে হত্যা করিয়াছে, আমি পুত্রহীন। পুত্রহত্যার প্রতিশোধের জন্য যজ্ঞ করিয়া তোমাকে পাইলাম, এখন তুমিই আমার পুত্র।

বৃত্র বলিল,—কি আদেশ হয়?

বিশ্বকর্ম্মা শুধু কহিলেন,—পুত্র হত্যার প্রতিশোধ।

বিশ্বকর্ম্মাকে প্রণাম করিয়া বৃত্র হিমালয়ে ঘোর তপস্যায় বসিল। বহুকাল তপস্যা করিবার পর ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,— কি বর চাও বৎস?

বৃত্র ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া কহিল,—ঠাকুর, ইন্দ্র এবং আর সকল দেবতা অপেক্ষা আমার শক্তি অধিক হউক। আর কাঠের অথবা লোহার অস্ত্রে যেন আমার মৃত্যু না হয়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—তথাস্তু! তাহার পর অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

তখন ইন্দ্র এবং দেবতাদের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বৃত্র স্বর্গ অধিকার করিয়া বসিল। তাহার অত্যাচারে ত্রিভুবন অস্থির হইয়া উঠিল।

বড় দুঃখে পড়িয়া দেবতারা ব্রহ্মার শরণ লইলেন। ইন্দ্র কহিলেন,—পিতামহ, আপনার বরে ত্রিভুবন বৃত্রের পায়ে দলিত হইতেছে। কতদিন আর এ দুঃখ সহিব? বিশ্বের জীব কতকাল আর এ অমঙ্গলে থাকিবে?

ব্রহ্মা কহিলেন,—বিশ্বকর্ম্মার ক্রোধই বৃত্রের মূর্ত্তি ধরিয়া বিশ্বের জীবকে আজ এত দুঃখ দিতেছে। ত্রিশিরাকে বধ করিয়া এই অনর্থ তুমিই বাধাইয়াছ।

ইন্দ্র কহিলেন,—পিতামহ, অপরাধের শাস্তি তো যথেষ্টই পাইলাম। এখন কিসে বৃত্রের বিনাশে বিশ্বের মঙ্গল হইবে, তাহার উপায় বলিয়া দিন।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অথর্ব্বার পুত্র মহামুনি দধীচির কাছে যাও। তিনি যদি তাঁহার দেহের অস্থি দেন, তবে তাঁহার তপস্যার তেজে সেই অস্থিতে 'বজ্র' নামে এক নূতন অস্ত্র হইবে। তার গর্জ্জনে জগৎ কাঁপিবে, স্পর্শে সব স্তব্ধ হইবে, অগ্নিতে সব দগ্ধ হইবে। সেই বজ্রেই বৃত্রের বিনাশ।

দেবতাদের লইয়া ইন্দ্র গেলেন দধীচির আশ্রমে। আশ্রমে পাতার কুটিরে বসিয়া দধীচি শিষ্যদের ধর্ম্মের কথা বলিতেছেন,—দেবতারা গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

ইন্দ্র কহিলেন,—মহামুনি দধীচি, ব্রহ্মার আদেশে আজ বড় বিপদে পড়িয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনার দয়া না পাইলে·········

দধীচি বলিলেন,—আমার দয়া! সে কি দেবরাজ? আপনারা যে আসিয়াছেন, সেই দয়ায় আমিই বরং ধন্য হইলাম। আদেশ করুন, আপনাদের এই দাসকে কি করিতে হইবে?

ইন্দ্র লজ্জায় মুখ নত করিয়া রহিলেন।

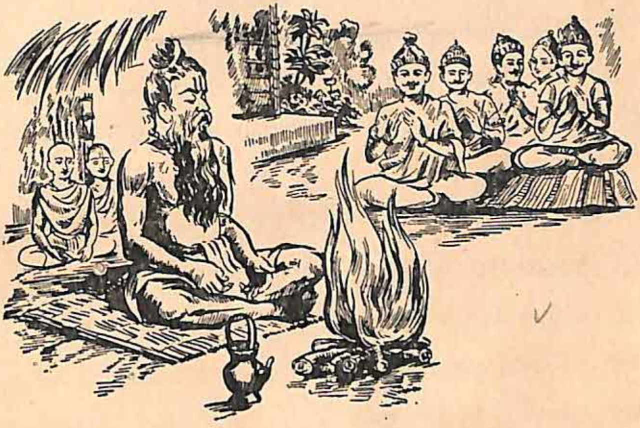
দধীচি কহিলেন, বলুন, কি করিলে আপনাদের ও সেই সঙ্গে জগতের মঙ্গল হইবে?—দেবরাজ, কোনরূপ সঙ্কোচ করিবেন না।

ইন্দ্র কহিলেন,—কি আর বলিব? আপনি তো জানেন, বৃত্রাসুরের তেজে আমরা অভিভূত হইয়া আছি। ভগবান ব্রহ্মার কাছে গিয়াছিলাম,—তিনি বলিলেন, আপনার দেহের অস্থিতে যে বজ্র হইবে, একমাত্র তাহা দ্বারাই বৃত্রের বিনাশ হইতে পারে।

দধীচি কহিলেন,—এই কথা দেবরাজ! ইহার জন্য এত সঙ্কোচ করিতেছিলেন? অসার এই দেহ, অসার এই অস্থি,—এই অস্থি দিয়া আজ বিশ্বের মঙ্গল সাধিতে পারিব,—এ যে বিধাতার অসীম দয়া! আজ আমি ধন্য হইলাম, কৃতার্থ হইলাম। দেবরাজ, একটু অপেক্ষা করুন। আমি শিষ্যদের লইয়া স্নান করিয়া আসি,—তাহার পর যোগে বসিয়া এই দেহ ত্যাগ করিব। আপনারা তাহা লইয়া যাইবেন।

দধীচি স্নানে চলিলেন। ছল ছল নয়নে সামগান করিতে করিতে তাঁহাকে ঘিরিয়া শিষ্যেরা সকলে চলিলেন। নদীতে সকলে স্নান করিলেন, তীরে বসিয়া জপ করিলেন। আবার মধুর সামগানে তপোবনের আকাশ ভরিয়া দধীচিকে ঘিরিয়া শিষ্যেরা কুটিরে আসিলেন। দেখিয়া দেবতাদের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

শিষ্যেরা প্রণাম করিলেন। দধীচি একে একে সকলকে বুকে ধরিয়া মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। কুটিরের মধ্যে হোমাগ্নি জ্বলিতেছিল,—দধীচি এবার আসনে বসিয়া মন্ত্র পড়িয়া



আহুতি দিলেন। আহুতি শেষ হইল। দধীচি ব্রহ্মকে ধ্যান করিয়া যোগে বসিলেন। শিষ্যেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া সমবেতকণ্ঠে সামগান করিতে লাগিলেন। দধীচির আত্মা ব্রহ্মপদে বিলীন হইয়া গেল।

দেবতারা তাঁহার দেহ লইয়া চলিয়া আসিলেন।

দধীচির অস্থিতে বজ্র হইল। ইন্দ্র সেই বজ্র লইয়া যুদ্ধে গেলেন। বিকট হুঙ্কার ছাড়িয়া কৃষ্ণবর্ণ বিশাল দেহে আকাশ ঢাকিয়া বৃত্র ছুটিয়া আসিল। ইন্দ্র তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বজ্র ছাড়িয়া দিলেন।

মহা ঘোর শব্দে দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত করিয়া বজ্র ছুটিল। বজ্র বৃত্রের বিশাল দেহের উপরে আসিয়া পড়িল! বৃত্র মরিল,—তাহার বিশাল দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

অনুশীলনী

১। দধীচির আত্মত্যাগ হইতে কি উপদেশ পাইলে?

২। কেমন করিয়া বৃত্রের সৃষ্টি হইল তাহা লিখ।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির সাহায্যে এক একটি বাক্য রচনা কর :—
আহুতি, প্রতিশোধ, অন্তর্হিত, ত্রিভুবন, শরণ, অনর্থ।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ



১৭৫৭ সালের ২৩এ জুন ইংরাজের পতাকা ওড়ে পলাশীর আমবাগানে।

তারপর শুরু হ'ল কোম্পানীর নির্ম্মম শোষণ। বাংলার ব্যবসা গেল, বাণিজ্য গেল ; লবণ, তামাক, সুপারি প্রভৃতি থেকে শুরু ক'রে বাংলার নিত্য-প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যের বাণিজ্যেই হ'ল কোম্পানীর একচেটে অধিকার। সমৃদ্ধ বাংলা হ'য়ে ওঠে নিরন্ন ; চাষীর বুক চিরে বেরোয় হাহাকার ; জমিদারী চড়ে নীলামে, জমিদার পথে বসে। সকল দিক দিয়েই বাঙালীর শিরদাঁড়া যায় ভেঙে।

সাধারণ মানুষের তখন অন্যায়ের প্রতিরোধ করার শক্তি না থাকলেও, বাংলাদেশে একদল সন্ন্যাসী সংঘবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়ালেন ইংরাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

যাঁরা সংসার ত্যাগ ক'রে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে সন্ন্যাসী হন, তাঁরা সাধারণতঃ লোকালয়ের কোন ব্যাপারের সঙ্গেই কোন সম্পর্ক রাখেন না,—তা সে সামাজিক ব্যাপারই হোক বা রাজনৈতিক ব্যাপারই হোক। হয় বিশেষ বিশেষ তীর্থস্থানে, না হয় লোকালয় থেকে দূরে কোন মঠে বা আশ্রমে ভগবানের চিন্তাতেই তাঁরা দিন কাটান। কিন্তু বাংলাদেশের একদল সন্ন্যাসী জনগণের দুঃখ-দুর্দ্দশায় উদাসীন থাকতে পারলেন না মোটেই। জনগণের কল্যাণই তাঁদের জীবনের আদর্শ। জনগণের অকল্যাণে উদাসীন থেকে ভগবানের উপাসনা চলে না, ধর্ম্মসাধন হ'তে পারে না। এই সন্ন্যাসীরা সংঘবদ্ধ হলেন ভবানী পাঠকের নেতৃত্বে।

তাঁরা স্থির করলেন, জনগণের দুঃখ-দুর্দ্দশার কারণ বিদেশীর অমানুষিক অত্যাচার ও শোষণ। বিদেশীর হাত থেকে এদের মুক্তি চাই আগে। এই বিদেশী ইংরাজ ধর্ম্ম মানে না, যুক্তি মানে না। বিবেকের বালাই তাদের নেই। অতএব তাদের মেরে তাড়াতে হবে। জনগণের মধ্যেও চেতনা জাগানো চাই।

এই সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সঙ্গে একদল মুসলমান ফকিরও সংঘবদ্ধ হলেন মজনু শার নেতৃত্বে। আর্ত্ত মানুষকে রক্ষা না ক'রে, তাকে উপেক্ষা ক'রে শুধু খোদাকে ডাকলে ধর্ম্ম হয় না,— এই সত্য তাঁরাও উপলব্ধি করেছিলেন।

হিন্দু সন্ন্যাসীরা নানা দিক থেকে এসে মিলিত হতেন এক একটা জায়গায় এক একটা বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান উপলক্ষে। ঢাকা জেলায় লাঙলবন্ধে ব্রহ্মপুত্র নদীতে স্নান উপলক্ষে সন্ন্যাসীরা

সমবেত হতেন এবং কার্য্যক্রম নিয়ে আলোচনা করতেন। বিশেষ তিথিতে ও বিশেষ দিনে প্রতি বছর গঙ্গাসাগরে স্নান করতে গিয়ে, অথবা পুরীতে রথযাত্রায় গিয়ে সকলে মিলিত হতেন। নেংটিপরা অথবা গেরুয়াপরা সাধুর দল সব জায়গায়ই আদর-যত্ন, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পেয়েছেন সকলের কাছে। খাওয়া-পরার ভাবনা এঁদের কোন দিন ছিল না; কি ধনী, কি দরিদ্র খুশী মতো যা দান করত, তাতেই যথেষ্ট হ'ত এঁদের। সুতরাং যারা এঁদের ভালবাসত এবং এঁরাও যাদের ভালবাসতেন, তাদের জন্য অস্ত্র ধারণ করাই এঁরা সত্যকার পুণ্যকর্ম্ম, সত্যকার ধর্ম্ম ব'লে গ্রহণ করলেন।

সন্ন্যাসী ও ফকিররা অস্ত্র-সংগ্রহ ও অস্ত্র-শিক্ষায় বিশেষ ক'রে মন দিলেন। নিষ্ঠার সহিত চেষ্টা ক'রে এঁরা হলেন খুব দুর্দ্ধর্ষ লাঠি খেলোয়াড়; এঁদের বর্শা তীর-ধনুর সন্ধান হ'য়ে উঠল অব্যর্থ। বন্দুক ছুঁড়তে এঁরা হলেন বিশেষ পারদর্শী, আর তরোয়াল চালাতে অত্যন্ত নিপুণ। ঘোড়-সওয়ারদের মতো ঘোড়ায় চ'ড়ে জেলার পর জেলা যেতেন অতিক্রম ক'রে। গহন বন এবং পাহাড়-পর্ব্বতের পথহীন পথেও এঁদের গতিবিধি ছিল অবাধ।

এই নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেমিক মুক্তি-সাধকদের সঙ্গে বহু জায়গায় দেশের শোষিত ও বঞ্চিত কৃষক, মজুর প্রভৃতি যোগ দিয়েছে হাজারে হাজারে। ইংরেজরা এদের বলেছে ডাকাত। ইংরেজের অত্যাচারে যারা বাধা দিয়েছে, তাদের ডাকাত বলা ইংরেজের পক্ষে স্বাভাবিক। ইংরেজের ইতিহাস যা-ই বলুক

না কেন, এই সন্ন্যাসী ও ফকিরের দল ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে একটানা চল্লিশ বছর ধ'রে—১৭৬০ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্য্যন্ত।

একদল সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ও ফকির সংঘবদ্ধ হ'য়ে জনগণের কল্যাণে অস্ত্র ধারণ ক'রে একটা বিশাল ও সুদৃঢ় রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে, এ দৃষ্টান্ত বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই। বাংলার মুক্তির ইতিহাস এঁরা ক'রে রেখেছেন গৌরবদীপ্ত।

নানা ঘাঁটি থেকে এঁরা চালিয়েছেন খণ্ড খণ্ড অভিযান, অর্থাৎ গরিলা যুদ্ধ করেছেন, এবং ইংরাজকে বিব্রত ক'রে অনেক অত্যাচারের প্রতিরোধ করেছেন। উত্তরবঙ্গে কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা;—পূর্ববঙ্গে ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল এবং তখনকার পশ্চিমবঙ্গে যশোহর ছিল এঁদের কার্য্য-কলাপের বিশেষ ক্ষেত্র।

ইংরাজের সঙ্গে এঁদের সংঘর্ষ খুব বেশি হয়েছে উত্তরবঙ্গে। কুচবিহারের রাজার পক্ষে সন্ন্যাসীরা যে যুদ্ধ করেছিলেন, তাতে বেগতিক দেখে ইংরাজ-সেনাপতি মরিসন্‌কে সসৈন্যে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে হয়েছিল। এর দু'তিন বছর পরেই জলপাইগুড়িতে এক যুদ্ধে মাট্‌ল সাহেব প্রাণ হারান সন্ন্যাসীদের হাতে। এর পরেই কিথ্‌ সাহেব সৈন্য-সামন্ত নিয়ে রংপুরে গেলেন সন্ন্যাসীদের ধরবার জন্য। ফলে তাঁকে আর ফিরে আসতে হ'ল না। তিনিও দলবল সহ প্রাণ দিলেন সন্ন্যাসীদের হাতে। এই রংপুরেই কিছুদিন পরে এক যুদ্ধে ক্যাপ্‌টেন টমাস্‌

নিহত হলেন সসৈন্যে। কিছুদিন পরেই আর এক যুদ্ধে প্রাণ দিলেন মেজর ডগ্‌লাস্‌ ও ক্যাপ্‌টেন এডোয়ার্ড।

সন্ন্যাসী ও ফকিররা চেষ্টা করেছেন কোম্পানীর অত্যাচার ও অবিচার বন্ধ করতে। প্রাণপণ শক্তিতে তাঁরা আঘাত হেনেছেন ইংরাজকে। শেষ সাফল্য-লাভ হোক্‌ বা না হোক্‌, আন্তরিক প্রয়াসের মূল্য সাফল্যের চেয়ে কম নয়।

এই সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের পটভূমিকায় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র "আনন্দমঠ" সৃষ্টি ক'রে সাহিত্যে এই বিদ্রোহকে অমরত্ব দান করেছেন।

—শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

অনুশীলনী

১। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের কাহিনী নিজের ভাষায় লিখ।

২। সন্ন্যাসীরা ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন কেন?

বৃষ্টি

চল নামি! আষাঢ় আসিয়াছে,—চল নামি!

আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু, এক এক জনে যূথিকা-কলির শুষ্ক মুখও ধুইতে পারি না, মল্লিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিতে পারি না; কিন্তু আমরা সহস্র-সহস্র, লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি;—মনে করিলে পৃথিবী ভাসাই। ক্ষুদ্র কে? দেখ, যে একা, সে-ই ক্ষুদ্র, সে-ই সামান্য। যাহার ঐক্য নাই, সে-ই তুচ্ছ।

দেখ, ভাইসকল, কেহ একা নামিও না; অর্দ্ধপথে ঐ প্রচণ্ড রবির কিরণে শুকাইয়া যাইবে। চল, সহস্রে-সহস্রে, লক্ষে-লক্ষে, অর্ব্বুদে-অর্ব্বুদে এই বিশোষিতা পৃথিবী ভাসাইব।

কে যুদ্ধ দিবে—বায়ু?—ইস্! বায়ুর ঘাড়ে চড়িয়া দেশ-দেশান্তরে বেড়াইব। আমাদের এ বর্ষাযুদ্ধে বায়ু ঘোড়া মাত্র। তাহার সাহায্য পাইলে জলে স্থলে এক করি। তাহার সাহায্য পাইলে, বড় বড় গ্রাম, অট্টালিকা স্রোতের মুখে ধুইয়া লইয়া যাই। তাহার ঘাড়ে চড়িয়া জানালা দিয়া লোকের ঘরে ঢুকি। বায়ু ত' আমাদের গোলাম!

দেখ ভাই, কেহ একা নামিও না—ঐক্যেই বল;—নহিলে আমরা কেহ নই। চল, আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু, কিন্তু পৃথিবী রাখিব। শস্যক্ষেত্রে শস্য জন্মাইব, মনুষ্য বাঁচিবে। তৃণলতা বৃক্ষাদির পুষ্টি করিব—পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ বাঁচিবে। আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু—আমাদের সমান কে? আমরাই সংসার রাখি।

দেখ, দেখ! আমাদের দেখিয়া পৃথিবীর আহ্লাদ দেখ! গাছপালা মাথা নাড়িতেছে, নদী দুলিতেছে, ধান্যক্ষেত্র মাথা নামাইয়া প্রণাম করিতেছে, চাষা চষিতেছে, ছেলে ভিজিতেছে।

আমরা জাতিতে জল, কিন্তু রঙ্গ-রস জানি। লোকের চাল ফুটা করিয়া ঘরে উঁকি মারি। মল্লিকার মধু ধুইয়া লইয়া ভ্রমরের অন্ন মারি। মুড়ি-মুড়কির দোকান দেখিলে প্রায় ফলার মাখিয়া দিয়া যাই। রামী চাকরাণী কাপড় শুকাইতে দিলে তাহার কাজ বাড়াইয়া রাখি।

তা' যাক্—আমাদের বল দেখ! দেখ, পর্ব্বত-কন্দর, দেশ-প্রদেশ ধুইয়া লইয়া নূতন দেশ নির্ম্মাণ করিব। কোনও দেশের মানুষ রাখিব—কোনও দেশের মানুষ মারিব; কত জাহাজ বহিব, কত জাহাজ ডুবাইব; পৃথিবী জলময় করিব, —অথচ আমরা কি ক্ষুদ্র?

আমাদের মত ক্ষুদ্র কে? আমাদের মত বলবান্ কে?

—৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অনুশীলনী

১। বঙ্কিমচন্দ্র কে ছিলেন? তাঁহার দুই একখানি পুস্তকের নাম কর দেখি।

২। ঐক্য সম্বন্ধে লেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিজের ভাষায় লিখ।

৩। সমাস ও ব্যাসবাক্য বল :—বর্ষাযুদ্ধে, পর্ব্বত-কন্দর।

সুদূরের আহ্বান

পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছি। কিন্তু সত্য বলিতে কি, আজিও আমার ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা মিটিল না। এ আকাঙ্ক্ষা বুঝিবা মিটিবার নয়। তাই পাঁচবার ভূ-পর্য্যটন করিবার পরও তোড়-জোড় করিয়া ঘর ছাড়িয়া আবার পৃথিবী-ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িতে হইল।

বাস্তবিকই এই বিশাল পৃথিবী আমার মনকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। ইহার বিশালতা, ইহার বৈচিত্র্য আমার চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলে। যত দেখি, ততই যেন দেখার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যায়।

আজিও মনে পড়ে নায়েগ্রার সেই অবিরাম জলপ্রবাহের উদ্দামতার কথা। কানে আসে আজিও তার প্রলয়োচ্ছ্বাসের সুগম্ভীর ধ্বনি। কর্ম্মক্লান্ত কলেবরে নির্জ্জন সন্ধ্যায় আরাম-কেদারায় দেহভার এলাইয়া দিয়া যখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকি, তখন চোখের উপর ভাসিয়া উঠে কত ছবি, কত স্বপ্ন, কত স্মৃতি। এই সকল ছবি, এই সকল স্মৃতিই আমার চিত্তকে অধিক দিন সংসারে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে দেয় না।

অনলস্রাবী বিসুবিয়াসের অগ্নিময় গর্ভদেশে নামিয়া সৃষ্টির কি ভীষণ রূপই না একদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম! আজিও সেই ভীষণ দৃশ্য চোখের উপর মাঝে মাঝে স্বপ্নের মত ভাসিয়া উঠে।

সেদিনকার কথা আজিও বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে। বহু নর-নারী সেদিন বিসুবিয়াসের শিখরদেশে সমবেত হইয়াছেন। প্রত্যেকের সহিত একজন করিয়া গাইড্। পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে একটি প্রকাণ্ড গহ্বর চারিদিক্ হইতে ঢালু হইয়া পর্ব্বতের গর্ভদেশে নামিয়া গিয়াছে। ইহাকে বলে আগ্নেয়গিরির ক্রেটার। এই ক্রেটারের মধ্যেই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের প্রচ্ছন্ন আয়োজন চলিতেছে। এই গহ্বর চারিদিক্ হইতে ঢালু হইয়া যেখানে আসিয়া শেষ হইয়াছে, সেইখানে অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড ও ধাতুরাশি প্রচণ্ড অগ্নিতাপে দগ্ধ হইয়া, ফাটিয়া, গলিয়া, চূর্ণ হইয়া দিবারাত্র একটা প্রলয়কাণ্ড করিতেছে।

অতগুলি যাত্রীর মধ্যে সেদিন ক্রেটারের মধ্যে নামিতে সাহস করিয়াছিলাম কেবল আমরা দুইজন ;—আমি এবং একজন আমেরিকান্ ভূ-পর্য্যটক।

পর্ব্বতে আরোহণ করিবার সময় যাত্রীরা যে-কোন গাইড্ সঙ্গে লইতে পারেন। কিন্তু ক্রেটারে নামিতে হইলে সরকারী গাইড্ সঙ্গে লইতে হয়। তাহা না হইলে কাহাকেও ক্রেটারের মধ্যে নামিতে দেওয়া হয় না। এই সকল সরকারী গাইড্ পর্ব্বতগর্ভে নামিবার পথ-ঘাট সম্বন্ধে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ।

আমরা দুইজন সাহস করিয়া নামিয়া পড়িলাম,—সঙ্গে দুইজন সরকারী গাইড্। যতই নামিতেছি, অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপ ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। গহ্বরের ঢালু গা বাহিয়া আমরা ক্রমেই নীচের দিকে নামিয়া চলিয়াছি। গড়ানের গায়ে অসংখ্য ফাটল। এই সকল ফাটল দিয়া উত্তপ্ত বাষ্পরাশি বেগে নির্গত হইতেছে।

ইহারই মধ্যে পথ করিয়া চলিয়াছি। যতই নামিতেছি, বাষ্প-স্রাবী ফাটলের সংখ্যা ততই বাড়িয়া চলিয়াছে, এবং চারিদিকের উত্তাপও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার পর এক স্থানে পৌঁছিয়া অনুভব করিলাম, উত্তাপ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পর আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব,। সেখান হইতে আসল অগ্নিকুণ্ডের দূরত্ব তখনও আন্দাজ সিকি মাইল হইবে।

এই ভয়ঙ্কর স্থানে দাঁড়াইয়া পৃথিবীর গর্ভস্থ আদিম অনলোত্তাপ সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিলাম।

এই সেই বিসুবিয়াস্—সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিসুবিয়াস্, যাহার প্রচণ্ড অগ্নিলীলার খামখেয়ালে একদিন হারকুলেনিয়াম্ ও পম্পিয়াই-এর মত দুইটি সমৃদ্ধ নগর দেখিতে দেখিতে লোক-চক্ষুর অন্তরালে বিলীন হইয়া গিয়াছিল।

পম্পিয়াই-এর ধ্বংসাবশেষের দৃশ্যই কি কম রহস্যময়! কত শত বৎসর ধরিয়া এই বিখ্যাত নগরটি মৃত্তিকা ও ভস্মরাশির তলে সমাহিত রহিল। তাহার অস্তিত্বের কথা মানুষ ভুলিয়া গেল। তাহার পর একদিন মৃত্তিকার তলদেশ হইতে মানুষ তাহাকে উদ্ধার করিল।

পম্পিয়াই-এর এই সকল ভগ্নস্তূপের বুকের মধ্যে রহিয়াছে একটি প্রাচীন সুসভ্য জাতির অতীত ইতিহাসের কয়েক অধ্যায়। আজিও সেই স্বপ্নপুরীর স্মৃতিমাধুরী আমার অবসরকালকে কবিত্বময় করিয়া তুলে।

পৃথিবীর এই সকল অতুল সম্পদ, এই সকল রহস্যময় অতীত স্মৃতি, এই সকল অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক শোভা আমার চিত্তকে

আকুল করিয়া তুলে। একবার কেন, বারবার দেখিলেও ইহাদের নূতনত্ব অম্লান থাকিয়া যায়। তাই বার বার সুদূরের আহ্বান আমাকে গৃহছাড়া করিয়াছে।

—শ্রীশরৎচন্দ্র বসাক (পরিবর্ত্তিত)

অনুশীলনী

১। বিসুবিয়াসের সম্বন্ধে কি জান লিখ।

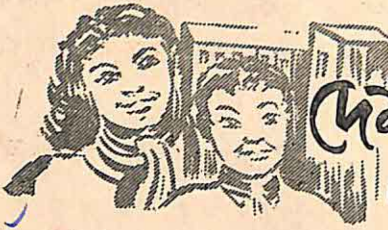
২। আগ্নেয়গিরির ক্রেটার কাহাকে বলে ?

৩। লেখক ক্রেটারের মধ্যে নামিয়া কি দেখিয়াছিলেন ?

৪। এক কথায় প্রকাশ কর ঃ—
যাহার সংখ্যা নাই ; যাহার সীমা নাই ; যাহা সহ্য করা যায় না।

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যেগুলি বিশেষ্য, সেগুলিকে বিশেষণে, এবং যেগুলি বিশেষণ, সেগুলিকে বিশেষ্যে পরিবর্ত্তিত কর ঃ—

উচ্ছ্বাস, ক্লান্ত, সৃষ্টি, ধাতু, অভিজ্ঞ, ইতিহাস।



দেশ-বিদেশের ছেলেমেয়ে

আমাদের দেশ ছাড়া ইংলণ্ড, রাশিয়া, আমেরিকা, জাপান, জার্ম্মানী এবং চীনের ছেলে-মেয়েরা কি ভাবে তাদের ছাত্র-জীবন কাটাচ্ছে তা জানবার আগ্রহ তোমাদের সকলেরই আছে, এ-কথা অনায়াসেই আমি ধরে নিতে পারি। সেইজন্য আজ তোমাদের জগতের অন্যান্য দেশের ছাত্রছাত্রীদের কথা এখানে বলছি। তোমাদের অবস্থার সঙ্গে তাদের অবস্থা তোমরা মিলিয়ে দেখো একবার।

বই পড়ে পরীক্ষায় পাশ সব দেশেরই ছাত্রদের করতে হয়। এ বিষয়ে এক দেশের ছেলেমেয়ের সঙ্গে অন্য দেশের ছেলেমেয়ের কোন তফাৎ নেই। কিন্তু বই পড়ে পরীক্ষায় পাশ করাই কি ছাত্র-জীবনের চরম লক্ষ্য? না, শুধু বই মুখস্থ করলেই চলবে না। বড় হয়ে যাতে তুমি তোমার দেশের একজন হতে পার, যাতে তোমাকে দিয়ে তোমার জাতির কল্যাণ হতে পারে, তার সমস্ত শিক্ষা তোমাকে ছেলেবেলাতেই নিতে হবে।

রাশিয়ার প্রত্যেক স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা মিলে একটা প্ল্যান অর্থাৎ কার্য্যপদ্ধতি ছ'কে নিয়েছে। পাঁচ বছর প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে সেই প্ল্যান-অনুযায়ী কাজ করতে হবে। এটা হ'ল তাদের শিক্ষার আসল অংশ। সেই প্ল্যান-মত

তারা এখন কাজ করছে এবং তার ফলে একদিকে নিজেরা যেমন নানা রকম জিনিস অতি সহজেই শিখছে, তেমনি অনায়াসে তারা তাদের দেশের প্রভূত কল্যাণ করছে।

সেই প্ল্যানের প্রধান কাজগুলির পরিচয় তোমাদের দিচ্ছি। প্রথম কাজ হ'ল, ছুটির সময় দল-বেঁধে ছেলেদের বেরুতে হবে চূণ আর ফস্‌ফরাসের খনি আবিষ্কার করবার জন্য। এই কাজটি খুবই সোজা, অথচ এর ফলে জাতির বিশেষ উপকার হতে পারে। ছেলেবেলা থেকে এই ভাবে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করার ফলে ছেলেদের মধ্যে আবিষ্কারের স্পৃহা আপনা থেকেই বেড়ে যাবে। রিবিন্‌স্ক বলে একটি ছেলে একটা বড় চূণের খনি এইভাবে আবিষ্কার করেছে। সেই খনির চূণ পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, ত থেকে খুব ভাল সার হয়। নোভো-সাইবেরিয়ার ছেলেরা এইভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের কয়লা এবং লোহার খনি আবিষ্কার করেছে।

এই প্ল্যান-অনুযায়ী, অবসর সময়ে, প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে বছরে অন্ততঃ আধ মণ করে ছেঁড়া কাপড়-চোপড়, হাড়ের টুকরো, ভাঙ্গা লোহা ইত্যাদি পরিত্যক্ত জিনিস সংগ্রহ করতে হবে। যে সব টুকরো জিনিস আমরা ফেলে দিই, তা থেকে কত লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস তৈরী হতে পারে তা আমরা ধারণা করতে পারি না। এই সব জিনিস সংগ্রহ করতে কোন ছেলেমেয়েকেই বিশেষ কোন কষ্ট করতে হয় না; অথচ সেই সংগ্রহ থেকে দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় হয়। এইভাবে খেলার মধ্য দিয়েও তারা দেশের উপকার করছে।

রাশিয়ার ছেলেমেয়েদের স্কুলের পড়ায় পাশ করা ছাড়া আর একটা অদ্ভুত বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়, এবং সে-বিষয়ে শুধু পাশ করা নয়, প্রত্যেক ছাত্রকেই পূরা নম্বর পেতে হয়। সে-বিষয়টি হ'ল, শস্য থেকে ভাল বীজ বাছতে শেখা। কৃষক মাঠে যে-সব বীজ ছড়ায়, তার মধ্যে অনেক খারাপ বীজ থাকে। খারাপ বীজ থেকে শস্য হয় না। এইভাবে বহু বীজ নষ্ট হয় এবং তার ফলে কৃষকদের বহু ক্ষতি হয়। যদি বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা এই বীজ-বাছার কাজ শেখে, তা হ'লে প্রত্যেক কৃষক-পরিবারের বিশেষ কল্যাণ হয়।

তোমরা এ কথা সকলেই জান যে, যা খেয়ে আমরা বেঁচে আছি, সেই খাদ্যশস্য কৃষকরাই আমাদের যোগায়, সুতরাং যাতে তাদের ভাল হয়, সে চেষ্টা সকলেরই করা উচিত। ছেলেমেয়েরাও তাদের অনায়াসে সাহায্য করতে পারে। রাশিয়ার প্রত্যেক ছেলেমেয়ের দলকে তাদের অবসর সময়ে বছরে দল-পিছু ত্রিশ মণ করে ছাই সংগ্রহ করতে হয়। এই ছাই জমির উৎকৃষ্ট সার। অতি তুচ্ছ জিনিষ এই ছাই। কিন্তু সার হিসাবে ব্যবহার করে তা থেকে বহু লক্ষ টাকার সংস্থান হয় এবং তা সংগ্রহ করাও অতি সহজ ব্যাপার।

এই ভাবে অবসর সময়ে খেলা করতে করতে তারা দেশের কাজ করছে। তারা বুঝছে যে, তাদের সঙ্গে তাদের দেশের একটা ঘনিষ্ট যোগ আছে। তাদের প্ল্যানের আর একটি কাজ হ'ল, প্রত্যেক ছেলেকে বছরে পাঁচটা ছুঁচো, দশটা ইঁদুর মারতেই হবে। প্রত্যেক দলকে বছরে অন্ততঃ দশটা বাড়ী

থেকে ছারপোকা, মশা-মাছি এবং আরসোলা তাড়াতে হবে। এই সব প্রাণী অসুখের বাহন। এদেরই জন্য দেশ মড়ক হয়, ঘরে ঘরে লোক ম্যালেরিয়া, টাইফয়েডে মরে। এই প্ল্যান-অনুযায়ী রাশিয়ার ছেলেমেয়েরা দশ বছরের মধ্যে পাঁচ লক্ষ বাড়ী থেকে এই সব প্রাণী দূর করবার ভার নিয়েছে। জাতির স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে এর চেয়ে বড় কাজ আর কিছুই হতে পারে না।

প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে প্রতি বৎসর অন্ততঃ দশটি করে গাছ পুঁততে হবে। জাপানের ছেলেদেরও বছরে একটি করে গাছ পুঁততে হয়। আমেরিকার স্কুলের ছেলেরা বছরে একদিন ছুটি পায়। সেদিন তাদের একটা বড় গাছের চারা সংগ্রহ করে পুঁততে হয়। গাছেরা মানুষের পরম বন্ধু। তাদের কাছ থেকে আমরা কাগজ পাই, ওষুধ পাই, শস্য পাই, ফল পাই, তেল পাই, কাঠ পাই, যে-কাঠ না হলে আমাদের বাস করা চলে না। খনি যেমন জাতির একটা মস্ত বড় সম্পদ, অরণ্যও তেমনি একটা সম্পদ্। স্কুলের ছেলেমেয়েরা খেলার ছলে এই সম্পদ্ বাড়াতে পারে।

রাশিয়ার ছেলেমেয়েরা আর একটা মস্ত বড় কাজ করছে। তাদের ওপর ভার পড়েছে নিরক্ষর লোকদের প্রাথমিক লেখাপড়া শেখানোর। প্রত্যেক দলকে ছক কেটে এক একটা জায়গার ভার দেওয়া হয়েছে। সেই জায়গার মধ্যে নিরক্ষর লোকদের বর্ণ-পরিচয় তাদের করাতে হবে। এইভাবে ছেলেমেয়েদের কাজে লাগিয়ে, অতি অল্প খরচে, রাশিয়া তাদের

দেশ থেকে নিরক্ষরতা তাড়িয়ে ফেলছে। চীনের ছেলেরাও ঠিক এই কাজ করছে। যে-দেশের শতকরা নব্বই জন লোকের বর্ণপরিচয় নেই, সে-দেশ কখনও বড় হতে পারে না। চীন বিরাট দেশ। অসংখ্য তার জনসংখ্যা। সেই জনসংখ্যার অধিকাংশই নিরক্ষর। সেই নিরক্ষর লোকদের শিক্ষার ভার স্কুলের ছেলেদের দেওয়া হয়েছে। বিনা খরচে জাতির এত বড় একটা কল্যাণকর কাজ ছেলেরাই সম্পাদন করছে।

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (পরিবর্তিত)

অনুশীলনী

১। রাশিয়ার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও দশের জন্য কি কি কাজ করে ?

২। শব্দার্থ লিখ :—স্পৃহা, নিরক্ষরতা, কল্যাণকর, প্রভূত, সম্পদ্‌।



আকস্মিকতা ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

হঠাৎ বড় হবার গল্প সংসারে অনেক শোনা যায়। পুরাকালে আমাদের দেশে মহর্ষি বাল্মীকি হঠাৎ এক ক্রৌঞ্চের হত্যা দেখে অমর শ্লোক 'মা নিষাদ'…ইত্যাদি বলেছিলেন। বিজ্ঞানের রাজ্যেও যে হঠাৎ কত বড় বড় আবিষ্কার হতে পারে সে খবর হয়ত অনেকে রাখে না।

প্রথম বলা যেতে পারে নিউটনের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব, অর্থাৎ সকল গ্রহ সকল গ্রহকে আকর্ষণ করছে এই মতবাদ।

সে বছর কেমব্রিজে হঠাৎ কোথা থেকে প্লেগের আমদানী হল ; সব লোক বিশ্ববিদ্যাল ছেড়ে পালিয়ে গেল। কোন কাজ না থাকায় নিউটন নিজের গ্রামে ফিরে এসে বাগানে বসে আঁক কষায় মন দিচ্ছেন, এমন সময় হঠাৎ মাটিতে পড়ল এক পাকা আপেল ফল। নিউটন ছিলেন বড় বুদ্ধিমান লোক,—অমনি সন্দেহ করলেন, মাটি না টানলে এ ফল মাটির দিকে নেমে

এল কেন ? অবশ্য এই সিদ্ধান্তকে দাঁড় করাবার জন্য তাঁকে গণিতের অনেক কূট তত্ত্বের সাহায্য নিতে হয়েছে। তবু জগৎ চিরকাল মনে রাখবে, মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারের মূলে ছিল হঠাৎ একটি আপেল-পড়া।

সবাই জান, আমাদের দেশে এক সময় প্রচুর নীলের চাষ ছিল। কিন্তু কেন যে নীলের চাষ এদেশ থেকে উঠে গেল সেকথা হয়তো অনেকে জাননা। এর কারণ, এক গবেষণাগারের সহকারী থার্মোমিটার দেখতে গিয়ে সেটিকে অসাবধানে ভেঙ্গে ফেলেছিলেন।

গল্পটি সংক্ষেপে এই। —রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নীল রং তৈরী করবার জন্য অনেকে চেষ্টা করেছিলেন। বিশেষ গবেষণার পর স্থির হয়, নেপ্‌থেলিনের সঙ্গে যদি অক্সিজেন কোনরকমে যুক্ত করে দেওয়া যায়, তাহলে নীল রং তৈরী হতে পারে ; কিন্তু এই অক্সিজেন কোন প্রক্রিয়ার দ্বারাই নেপ্‌থেলিনের সঙ্গে মেশে না। এক কাচপাত্রে এই মেশানোর চেষ্টা চলছিল, এবং তার তাপ মাপবার জন্য তাতে লাগান ছিল এক থার্মোমিটার। হঠাৎ এই থার্মোমিটারটি এক সহকারীর হাত লেগে গেল ভেঙ্গে এবং তার ভিতরকার পারদটুকু গেল ভিতরে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, ঐ পারদটুকুর সংযোগ হতেই, এতদিন যা মিশেছিলোনা কিছুতেই, সেই অক্সিজেনের সঙ্গে নেপথেলিন দিব্যি মিশে গিয়ে তৈরী হয়ে গেছে নীল রং।—সেই নীল রং বাজারে এসে পৌঁছল। ভারতে নীল গাছের চাষ উঠে গেল হঠাৎ এক সহকারীর অসাবধানতার প্রকৃষ্ট পরিচয় স্বরূপ থার্মোমিটার ভাঙার ফলে।

পার্কিন নামে একজন ইংরেজ রাসায়নিক মনে করেছিলেন, আলকাতরা থেকে কুইনাইন পাওয়া যেতে পারে। তাঁর বিশ্বাস এমনি দৃঢ় ছিল যে কুড়িবার নিষ্ফল হয়েও তিনি এর আশা ছাড়েন নি। কিন্তু কেবলি পরীক্ষার শেষে এক কালো রংয়ের খানিকটা জিনিজ পড়ে থাকে ; সেটা যে কি, তাও পার্কিন স্থির করে উঠতে পারেননি। প্রতিবারেই গভীর নৈরাশ্যে তিনি এই কৃষ্ণবর্ণ পদার্থটিকে ফেলে দিয়ে এসেছেন ; একবার তাঁর মনে হল, একটু য়্যালকহল দিয়ে দেখা যাক্। এই য়্যালকহল জিনিসটিতে রাসায়নিকের বড় প্রয়োজন;—জলে যেমন চিনি গলে যায়, অনেক জিনিস তেমনি য়্যালকহলে গলে যায়। যেমন য়্যালকহল দেওয়া অমনি সেই কালো পদার্থটি উজ্জ্বল লাল রঙে পরিণত হ'ল। এই এনিলিন রং-এর জগতে এক নতুন যুগ এনে দিয়েছে।

রবার এখন আমাদের সকল কাজেই ব্যবহৃত হচ্ছে ; মোটরের টায়ার থেকে আরম্ভ করে ছেলেদের খেলনা পর্য্যন্ত রবার দিয়ে তৈরী করা যায়। রবারের গাছ আছে। তার আঠা থেকে রবার তৈরী হয় ; কিন্তু এই অবস্থায় তার কোন জোর থাকে না। তাকে বিশেষ কোন ভারী কাজে দেওয়া যায় না, একটু গরমেই গলে যায়। কি উপায়ে এই রবারকে শক্ত করা যায় এই ছিল আজ থেকে একশো বছর আগের এক প্রকাণ্ড সমস্যা। আর সে সমস্যার সমাধান করেছেন হঠাৎ আমেরিকার এক ভদ্রলোক, চার্লস্ গুড্ইয়ার।

নিতান্তই অকারণে হঠাৎ একদিন গন্ধকের সঙ্গে রবার গেল মিশে। আর তারই ফলে রবার এমন এক অবস্থায় এল, যখন

তাকে সব রকম শক্ত কাজে অতি সহজেই ব্যবহার করা যেতে লাগল। ইংরাজীতে একে বলে ভ্যালক্যানাইজেসন। আচম্‌কা গন্ধকের সঙ্গে রবার মিশেছিল বলেই না এত শীঘ্র এত বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল!

এক্সরে, যাকে আমরা বাংলায় বলি রঞ্জনরশ্মি, সেও এমনি একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা অবলম্বন করে বিশ্বের দরবারে হাজির হয়েছে। অধ্যাপক রণ্টজেনের এক অতি অদ্ভুত খেয়াল ছিল। ৩০ ইঞ্চির চেয়ে বড় একটি কাচের নলে পারদ পুরে যদি আর একটি পারদের বাটির উপর উপুড় করে ধরা যায়, তাহলে বাতাসের চাপে ৩০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত পারদ নলে দাঁড়িয়ে থাকে;—তার উপর একেবারে শূন্য। এই শূন্যের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ দিলে কি হয় রণ্টজেন সেই পরীক্ষা করতে বড় ভালবাসতেন।

তাঁর টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে কতকগুলি আলোকচিত্র নেবার প্লেট ছিল। একদিন তিনি তাঁর বিদ্যুৎপ্রবাহ পরীক্ষার পর অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে দেখতে পেলেন, ড্রয়ারের ভেতরে তাঁর প্লেটগুলি সব আলো লেগে নষ্ট হয়ে গেছে। কি করে প্লেটে আলো লাগল? তিনি নিশ্চিত জানতেন,—আলো কখন তাঁর প্লেটে যে · পারে না অবশেষে অনেক গবেষণার পর বুঝতে পারলেন, শূন্যের মধ্যে বিদ্যুতের প্রবাহ দিলে তার থেকে এমন এক আলোকরশ্মির উৎপত্তি হয়, যা কাঠ বা যে কোন হালকা আবরণ ভেদ করে যেতে পারে। হঠাৎ সেদিন টেবিলের ড্রয়ারে প্লেটগুলি ছিল বলেই ত আজ রঞ্জনরশ্মি দিয়ে আমরা এত উপকার পাচ্ছি!

সুযোগ আমাদের জীবনে যে কত বড় জিনিষ, তা অনেক সময় বুঝতে পারি না। সামান্য ঘটনাকে আশ্রয় করে জগতে যে কত বড় বড় কাজ হয়েছে, তাও অনেক সময় আমরা এক সঙ্গে ভেবে দেখি না। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে, সুযোগ সবার কাছে আসে—তার পক্ষপাতিত্ব নেই। তবে তারাই সুযোগকে কাজে লাগাতে পারে, যাদের সে প্রতিভা আছে। কেন না, যেখানেই কোন বড় আবিষ্কার হয়েছে, তার পিছনেই বিরাট সাধনা আছে।

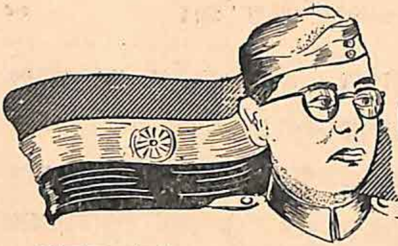
—শুভেন্দুশেখর বসু (পরিবর্তিত)

অনুশীলনী

১। নিউটন কি ভাবে মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কার করেন ?

২। রাসায়নিক নীল রং কি ভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছিল ?

৩। রণ্টজেন সাহেব কিরূপে এক্স-রে আবিষ্কার করিয়াছিলেন ?



নেতাজী

হাজার হাজার বছর আগেকার কথা বলছি। মিশর দেশে হয়েছে অনাবৃষ্টি। একে মরুভূমির দেশ, তার উপর এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। নীল নদে ঢল্ নামে ফি-বছর।—আশেপাশের জমি তাইতে সরস হয়ে ওঠে,—শস্য জন্মে সেই সব জমিতে। সে-বছর নীল নদেও ঢল্ নামেনি। চারিদিকে হাহাকার পড়ে গেছে।—দুর্ভিক্ষে মরতে হবে সবাইকে। রাজা ডেকে পাঠান বড় বড় পণ্ডিতদের ;—বলেন—"খুলুন পুঁথিপত্তর ; ঘাঁটুন শাস্ত্র ; বার করুন একটা উপায়!—মন্ত্র-তন্ত্র, যাগ-যজ্ঞ, যা হয় একটা কিছু ;—যাতে বৃষ্টি হয়,—লোকে অনাহারের হাত থেকে বাঁচে।"

বড় বড় পণ্ডিত আর পুরোহিতদের ভিড়ে রাজসভা গম্‌গম্ করে ওঠে ; পাহাড়-প্রমাণ পুঁথিপত্তর জমা হয়ে ওঠে রাজ-সভায়। হুমড়ি খেয়ে পড়েন পণ্ডিতের দল পুঁথিপত্তরের উপর। খোঁজ্—খোঁজ্—খোঁজ্!—কোথাও যদি কিছু উপায় লেখা থাকে।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটে এমনি করে।—তার পর হঠাৎ একদিন এক দিগ্‌গজ পণ্ডিত চেঁচিয়ে ওঠেন—"পাওয়া গেছে—উপায় পাওয়া গেছে—শাস্ত্র-বাক্য, ঋষি-বাক্য!"

"শাস্ত্রে কি লিখেছে চেঁচিয়ে পড়ুন!"—সভাশুদ্ধ লোক হৈ হৈ করে বলে ওঠে।

দিগ্‌গজ পণ্ডিত হাত-মুখ নেড়ে শাস্ত্র্য-বাক্য পড়ে যান।

কেউ কিছু বুঝতে পারে না ;—কঠিন তার ভাষা।—বলে—"সোজা করে মানে বুঝিয়ে দিন্ ওর!"

দিগ্‌গজ পণ্ডিত শাস্ত্র বাক্য সোজা করে বলতে থাকেন।—বলেন—"শাস্ত্রে লিখছে, রাজ্যশুদ্ধ লোক যদি একই স্থানে একই সময়ে জমায়েত হয়ে আকুল কণ্ঠে জলের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, তাহলে ভগবান আকাশ থেকে জল নিশ্চয়ই ঢালবেন ;—একটু-আধটু জল নয়,—একবারে মুষলধারে বৃষ্টি ;—দেশ একবারে জলে জলময় হয়ে উঠবে। শাস্ত্রের বচন, ঋষি-বাক্য কখন মিথ্যা হয় না!"

সভাশুদ্ধ-লোক চেঁচিয়ে ওঠে—"তবে সেই ব্যবস্থাই করুন মহারাজ—সেই ব্যবস্থাই করুন!—প্রজাদের প্রাণ বাঁচান!"

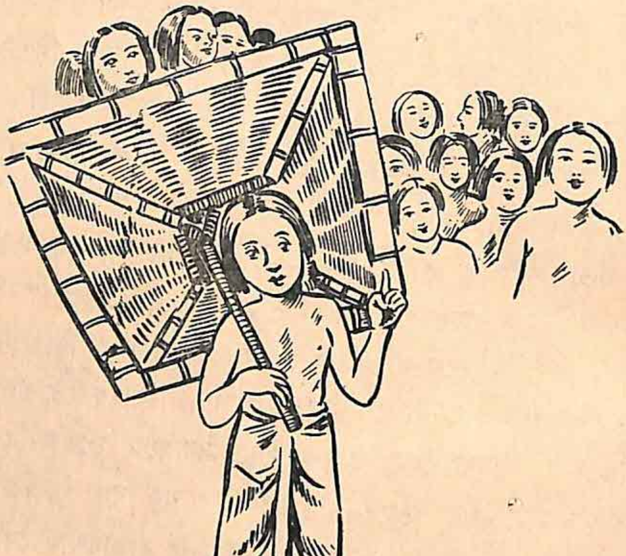
পাঁজি-পুঁথি দেখে পণ্ডিতেরা শুভদিন স্থির করে দিয়েছেন। রাস্তায়-রাস্তায় ঢাক-পিটিয়ে সময় জানান হয়েছে রাজ্যশুদ্ধ লোককে। অমুক দিন, অমুক সময়ে সবাইকে গিয়ে জমায়েত হতে হবে নীল নদীর তীরে। রাজা আর বড় বড় পণ্ডিতদের জন্য তৈরী হবে উঁচু বেদি। সময় হলেই রাজামশাই বেদির উপর দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে দু-হাত তুলবেন ;—সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠতে হবে—"জল দাও ভগবান!—জল দাও!—বাঁচাও আমাদের!—তুমি ছাড়া গতি নেই কিছু!"

আজ সেই দিন এসেছে। কাতারে কাতারে লোক চলেছে নীল নদের দিকে ;—রাজ্যশুদ্ধ লোক।

ভিড়ের মধ্যে দেখা যাচ্ছে একটি ছেলেকে ;—দশ-বারো বছরের ছোট ছেলে ;—সঙ্গে নিয়েছে এক প্রকাণ্ড সেকেলে ছাতা।

সবাই দেখে আর হাসে ;—হাসে আর দেখে। বলে—"ছাতা নিয়ে বেরিয়েছিস্ যে বড় ?"

ছেলেটি সে কথার কোন উত্তর দেয় না, উল্টে তাদেরই প্রশ্ন করে বসে—"আপনারা ছাতা নেন নি ?"



তারা বলে—ছাতা ?—ছাতা নিতে যাবো কেন ? মেঘ নেই, শুধু শুধু ছাতা বইতে যাবো কি দুঃখে ?"

ছেলেটি বলে—"এখন না হয় মেঘ নেই, কিন্তু আমরা যখন ভগবানকে ডেকে বলবো—'ভগবান, বৃষ্টি দাও' !—তখন ছাতার দরকার হবে যে !"

সেদিন সত্য সত্যই মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছিল। কার জন্য জান?—ঐ ছেলেটির জন্য। শাস্ত্র-বাক্য সকলে শুনেছিল শুধুই,—বিশ্বাস করেছিল কেবল ঐ ছেলেটিই,—আর কেউ নয়। তাই ওর প্রার্থনা শুনেছিলেন ভগবান।

আমাদের ঋষিদের বলা হ'ত মন্ত্র-দ্রষ্টা। মন্ত্রকে তাঁরা চোখের সামনে দেখতে পেতেন, তাই ওঁদের মন্ত্র-দ্রষ্টা বলা হ'ত। তাঁরা মন্ত্র বুঝতেন না শুধু;—শাস্ত্রের কথাগুলো তাঁদের চোখের স্মুখে রূপ নিত,—যেমন করে মিশরের ঐ ছোট ছেলেটি চোখের স্মুখে দেখেছিল—প্রার্থনার পর আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে।

মিশর দেশের গল্প শুনলে ত! এইবার চলে এস আমাদের বাংলা দেশে। প্রাচীন যুগের বাংলা দেশে নয়, আমাদের সময়কার বাংলা দেশে।

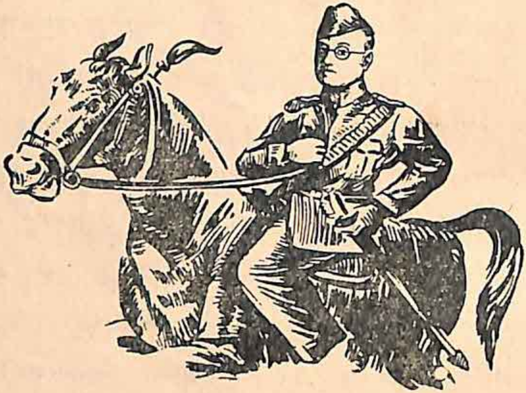
১৯২৮ সালের কথা বলছি। সে বছর কলকতায় হবে কংগ্রেসের অধিবেশন। এবারকার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর নাম সকলেই জান তোমরা;—ইনি তাঁরই পিতা।

স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠিত হয়েছে। তাদের নেতা হয়েছেন একটি বাঙ্গালী যুবক।

স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী চলেছে রাজপথ দিয়ে কুচ্‌কাওয়াজ করে। আগে চলেছেন তাদের সেনাপতি। পোষাকের ঘটা দেখে লোকে হাসাহাসি করতে থাকে,—একবারে আধুনিক যুগের সত্যকার সেনাপতির পোষাক;—কোথাও এতটুকু অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই;—যে কোন স্বাধীন দেশের আধুনিক সেনাপতির

পোষাকের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারা যায় নিখুঁত-ভাবে। কোথাও এতটুকু ফাঁক খুঁজে পাবে না। যেন আধুনিক কোন স্বাধীন দেশের সেনাপতি কুচ্‌কাওয়াজ করে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁর সেনাবাহিনীকে। চলন-বলন, মুখের ভাব সবই ঠিক সত্যকার সেনাপতির মত।

লোকে হাসে ;—বলাবলি করে—'লোকটা পাগল নাকি ! কোথায় কি তার ঠিক নেই ;—একবারে যুদ্ধের পোষাক পরে এসে হাজির।'



কাগজে কাগজে বেরোয় ছবি আর কার্টুন্‌। সবাই করে বিদ্রূপ।—বলে—"যাত্রার সং !"

মিশর দেশের ছেলেটিকে যেমন করে সবাই জিজ্ঞাসা করেছিল—"আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটা নেই, তবু ছাতা নিয়ে বেরিয়েছ যে বড় ছোকরা ?" তেমনি করে দেশশুদ্ধ লোক মনে মনে এই যুবকটিকে সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিল—"যুদ্ধের নাম-গন্ধ নেই, তবু অত ঘটা করে যুদ্ধের সাজ-পোষাক পরে সং সেজেছ কেন বলত বাপু ?"

মুখে উত্তর দেন নি যুবকটি সেদিন ; কিন্তু মনে মনে কি উত্তর

দিয়েছিলেন জান? উত্তর দিয়েছিলেন—"সে কি!—আমি যে দেখতে পাচ্ছি, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে, আর আমাদের ডাক পড়েছে সেই যুদ্ধে। তাই ত সেজেগুজে বেরিয়ে পড়েছি।—তোমরা সাজ নি?"

তার পরেই চলে এস ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবরে। এই দিন আজাদ-হিন্দ-গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা-বাণী শোনান হয় ভারতের বাইরে থেকে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে।

তার পর কাগজে-কাগজে ছবি বেরোয় আজাদ্-হিন্দ্-ফৌজের আর তাদের সেনাপতির। ১৯২৮ সালে তোলা বাঙ্গালী স্বেচ্ছা-সেবক-বাহিনীর সেই যুবক সেনাপতিটির ছবি আর আজাদ্-হিন্দ্-ফৌজের সেনাপতির ছবি পাশাপাশি রেখে দেখ দেখি!—হুবহু মিলে যায় নাকি? নিশ্চয়ই মেলে;—একবারে হুবহু মিল! সেই পোষাক, সেই দাঁড়াবার ভঙ্গি, সেই মুখের ভাব, সেই সব।

যুবক সেদিন যা দেখতে পেয়েছিলেন দিব্যচক্ষে,—এতদিনে তা সত্য হয়ে উঠলো—একবারে প্রত্যক্ষ সত্য,—জলজ্যান্ত সত্য। স্বদেশের জন্য যুদ্ধে সত্যই তাঁর ডাক পড়লো এত দিনে।

আর কিছু বলবার নেই আমার। শুধু বল—নেতাজীর জয়! জয়-হিন্দ্!

অনুশীলনী

১। নেতাজীর সহিত মিশরের বালকটির চরিত্রগত মিল কোথায় তাহা দেখাও।

২। ভগবান ছেলেটির প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন কেন?

৩। আমাদের ঋষিদের মন্ত্র-দ্রষ্টা বলা হয় কি কারণে?



দুর্গম পথের যাত্রী

দক্ষিণ আমেরিকা দেশটি আমাদের ভারতবর্ষের প্রায় চতুর্গুণ। এইখানেই পৃথিবীর গভীরতম নদী আমাজন। এই আমাজন নদীর অববাহিকার পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্যানী এত নিবিড় যে মধ্যাহ্নের সূর্য্যালোকও সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এখানে গাছের পাতা পড়িয়া স্তূপীকৃত হইয়া আছে। অতিকায় মশক, রক্তচোষা 'ভ্যাম্পার', শূকর জাতীয় 'টেপির', 'জেগুয়ার' নামক ব্যাঘ্র এবং 'পিউমা' নামক এক শ্রেণীর সিংহ এই বনে বিচরণ করে।

এই দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন, ম্যাড্রি-ড়ি-ডাইয়স্, বেণী প্রভৃতি নদী ও উপনদীর গতিপথ আবিষ্কারের দুর্গম পথে যাঁহারা জীবনপণ করিয়া নামিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কর্ণেল ফসেট্-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গত ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিজের পুত্র এবং অপর একজন ইংরাজ সঙ্গীকে লইয়া আমাজন নদীর উৎস আবিষ্কার করিতে গিয়া আর ফিরিয়া আসেন নাই।

দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে যতকিছু গুণ থাকা দরকার, কর্ণেল ফসেটের তাহা ছিল।

বড় বিপদের সময় কতখানি ধৈর্য্য অবলম্বন করিলে মানুষ আত্মরক্ষা করিতে পারে, ফসেটের জীবনচরিত হইতে সেই কথাই আজ তোমাদের বলিব।

ম্যাড্রি-ডি-ভাইয়স্ নদীটি সাপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে বলিয়া স্থানীয় লোকে ইহাকে 'সর্প নদী' বলে। এই সর্প নদীর একটি উপনদী আছে, তাহার নাম হিথ্। কর্ণেল ফসেট্ একবার সর্প নদীর দিক হইতে এই হিথ্ নদী ধরিয়া উহার উৎপত্তি-স্থানের দিকে গিয়াছিলেন। হিথ্ নদীটি আকারে ছোট—তার উপর আবার গাছপালা পড়িয়া স্থানে স্থানে নদীপথ অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। 'গোয়ারাও' নামক এক শ্রেণীর নর-খাদক জংলী সেই নদীর ধারে জঙ্গলে বাস করে। তাহাদের অত্যাচারের ভয়ে কেহ এই পথ দিয়া যাইতে চায় না। কর্ণেল ফসেট্ কিন্তু এই 'গোয়ারাও'দের অগ্রাহ্য করিয়া চলিলেন।

সর্প নদী ছাড়িয়া প্রথম পঞ্চাশ মাইল একরূপ ভালই কাটিল। ছয়জন ইংরাজ, সঙ্গে যথেষ্ট খাদ্য এবং তিন খানা নৌকা। হঠাৎ তাঁহারা দেখিলেন,—সম্মুখে অসভ্য জংলীদের আড্ডা।

এই স্থানে নদীটা প্রায় ত্রিশ গজ চওড়া। অসভ্যরা নদীর চড়ার উপর কুড়েঘর বাঁধিয়াছে। তাদের ঘাটে প্রায় চৌদ্দ পনরখানা ডিঙ্গি বাঁধা আছে। একটা পোষা বানরও আছে। তাহারা কর্ণেল ফসেটদের দেখিতে পাইয়া তাহাদের ঘরবাড়ী ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি ওপারের উঁচু লাল মাটির ঢিবির ওপাশে

গিয়া দাঁড়াইল। ফসেট্ আস্তে আস্তে নৌকা চালাইলেন; কিন্তু হঠাৎ সেই ঢিবির নিকট হইতে লোকগুলি কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। ফসেট্ জানিতেন, অসভ্যদের এইরূপ হঠাৎ একসঙ্গে পলায়ন খুব সুলক্ষণ নয়। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নাই—তীরের বনভূমি একেবারে নিস্তব্ধ। ফসেট্ বুঝিলেন, ইহা ঝড় উঠিবার পূর্ব্ব লক্ষণ। হঠাৎ ওপারের উঁচু ঢিবির নিকট হইতে শন্ করিয়া একটা তীর আসিয়া ফসেটের নৌকার কাঠে বিঁধিয়া গেল। তারপর একটা এবং আরও একটা।

ফসেটের সঙ্গীরা অমনি কট্ কট্ বন্দুক খুলিয়া কার্টিজ ভরিয়া ফেলিল। ফসেট্ তাহাদের গুলি ছুঁড়িতে নিষেধ করিলেন। তিনি জানিতেন, এই তীরের বিনিময়ে বন্দুক ছুঁড়িলে অসভ্যদের হাতে তাঁহাদের মৃত্যু অনিবার্য্য হইবে।

দেখিতে দেখিতে অসভ্যদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। অসভ্যেরা সংখ্যায় তখন প্রায় তিনশো; তাদের বাণগুলো সাত আট ফিট লম্বা এবং তার গতি ঠিক রাখিবার জন্য পিছন দিকে পাখীর পালক আঁটা।

ফসেটের দলের লোকেরা কেহ নৌকার খোলের মধ্যে লুকাইয়া, কেহ বাহিরে নৌকার পাশে আত্মগোপন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতেছিল।

অবশেষে হঠাৎ তাহাদেরই একটি বাণ আসিয়া তাহাদের পরিত্যক্ত তালপাতার কুটিরের সম্মুখে যে বানরটি বাঁধা ছিল তাহার গায়ে লাগিল। বানরটি সঙ্গে সঙ্গে প্রাণত্যাগ করিল।

ফসেট্ দেখিলেন, অবস্থা ক্রমেই গুরুতর হইতেছে। তখন তিনি সাহসে ভর করিয়া বন্দুক ফেলিয়া দিয়া একাই একখানা নৌকা লইয়া তাহাদের দিকে চলিলেন !

তাঁহার এই সাহস দেখিয়া এবং সম্ভবতঃ খালি হাতে তিনি কিছু মন্দ অভিপ্রায়ে আসিতেছেন না, মনে করিয়া তাহারাও তীর-নিক্ষেপে বিরত হইল।

ফসেটের নৌকা কূলে লাগিলে অসভ্যদের কয়েকজন সাহস করিয়া অগ্রসর হইল। ফসেট্ বলিলেন,—'বেল গো ভো'—অর্থাৎ আমি তোমোদের বন্ধু। তখন তাহারা আরও নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। ফসেট্ নানাবিধ সঙ্কেত এবং যে কয়টি শব্দ জানিতেন, তাহাদ্বারা বুঝাইয়া দিলেন, তিনি তাহাদের একটুও ক্ষতি করিবেন না।

একজন যণ্ডামার্ক জংলী মোটা একটা লাঠি লইয়া ফসেট্‌কে তাড়া করিল। ফসেটের হাতে নৌকা চালাইবার দাঁড় ছিল। তাড়াতাড়ি তিনি সেটা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া পিঠ পাতিয়া দিয়া বলিলেন, 'আগাই ভা মেডেকু'—অর্থাৎ পরদেশী ক্ষুধার্ত্ত বন্ধু তোমার দ্বারে দুটি অন্ন চাহিতেছে, তুমি তাহাকে প্রহার করিয়া মারিয়া ফেল।'

সর্দ্দার তাড়াতাড়ি সেই লোকটির হাত ধরিয়া মারিতে নিষেধ করিলেন। ফসেট্ সর্দ্দারকে পেটে হাত দিয়া দেখাইলেন, তিনি খুব ক্ষুধার্ত্ত। তারপর সর্দ্দারের হুকুমে আহার্য্য আসিল, গোয়ারাওদের দলে একটা আনন্দ-উৎসব আরম্ভ হইল। কর্ণেল ফসেটের পূর্ব্বে এই অসভ্য এবং নরখাদক

গোয়ারাওদের সম্মুখে যাঁহারাই পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বন্দুক চালাইয়া অবশেষে নিজেরাই প্রাণ হারাইয়াছেন। ফসেটের সাহস অদ্ভুত এবং আত্মবিশ্বাসও অসাধারণ। তিনি বন্দুক ফেলিয়া দিয়া একবারে নিরস্ত্র হইয়া এই ভীষণ জংলীদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'আমি তোমাদের বন্ধু' আর অমনি গোয়ারাওদের হিংসা-প্রবৃত্তি কোথায় চলিয়া গেল। পুরাতন বন্ধুকে ফিরিয়া পাইয়া লোকে যেরূপ আনন্দ করে, ফসেটকে লইয়া এই অসভ্যের দল সেইরূপ উৎসব করিতে লাগিল।

কয়েক ঘণ্টা পরে কর্ণেল ফসেট্ যখন জঙ্গলের ভিতর হইতে বাহির হইলেন, তখন দেখা গেল, একপাল গোয়ারাও বন্ধু-ভাবে তাঁহার অনুগমন করিতেছে। ফসেট্ একটি বিশিষ্ট বন্ধুও পাইয়াছেন, সেটি গোয়ারাও-সর্দ্দারের সাত বৎসরের ছেলে। বন্ধুটি তাঁহার হাত ধরিয়া পাশে পাশে আসিতেছে— তার মাথায় ফসেটের নিজের মাথার টুপী।

—শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী (পরিবর্ত্তিত)

অনুশীলনী

১। ফসেট্ কিরূপে নিজের এবং সঙ্গীদের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন ?

২। কাহিনীটি নিজের ভাষায় লিখ।



প্রার্থনা

ওহে দেব, ভেঙে দাও ভীতির শৃঙ্খল,
ছিঁড়ে দাও লাজের বন্ধন ;
সমুদয় আপনারে দিই একেবারে
জগতের পায়ে বিসর্জ্জন।
স্বামিন্, নিদেশ তব হৃদয়ে ধরিয়া
তোমারি নির্দ্দিষ্ট করি কাজ।—
ছোট হো'ক বড় হো'ক, পরের নয়নে
পড়ুক্ বা না পড়ুক্, তাহে কেন লাজ ?
তুমি জীবনের প্রভু, তব ভৃত্য হ'য়ে
বিলাইব বিভব তোমার ;
আমার কি লাজ ?—আমি ততটুকু দিব,
তুমি দেছ যেটুকুর ভার।

ভুলে যাই আপনারে, যশঃ অপবাদ
কভু যেন স্মরণে না আসে ;
প্রেমের আলোক দাও, নির্ভরের বল,
তোমাতেই তৃপ্ত কর দাসে।

—কামিনী রায়

অনুশীলনী

১। কবিতাটির সারমর্ম্ম নিজের ভাষায় লিখ।

২। ব্যাখ্যা কর :—(ক) 'সমুদয়······বিসর্জ্জন।'

(খ) 'তুমি জীবনের প্রভু······যেটুকুর ভার।'

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর :—শৃঙ্খল, বিসর্জ্জন, অপবাদ, তৃপ্ত।



বঙ্গভূমির প্রতি

রেখো মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ
ঘটে যদি পরমাদ—
মধুহীন করো না গো, তব মনঃ-কোকনদে!
প্রবাসে দৈবের বশে
জীবতারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হ'তে, নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে?
চিরস্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে!
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি মা ডরি শমনে,
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে!
সে-ই ধন্য নরকুলে,
লোকে যাঁরে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে
হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্যামা জন্মদে।

তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!
ফুটি যেন স্মৃতিজলে,
মানসে মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস—কি বসন্ত কি শরদে।

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

অনুশীলনী

১। ব্যাখ্যা কর :—(ক) 'জন্মিলে……জীবন-নদে।' (খ) সে-ই ধন্য……সর্ব্বজন।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ বল :—পরমাদ, কোকনদ, প্রবাস, জীবতারা, শমন, জন্মদে, সুবরদে, তামরস।

কুটুম্বিতা

কেরোসিন-শিখা বলে মাটির প্রদীপে,
'ভাই ব'লে ডাক যদি দেব গলা টিপে।'
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা,
কেরোসিন বলি' উঠে, 'এসো মোর দাদা!'

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুশীলনী

১। কেরোসিন-শিখা মাটির প্রদীপকে অবজ্ঞা করিয়া চাঁদকে খাতির করিতে গেল কেন? ইহা হইতে কি বুঝা গেল?

২। এই কবিতাটিতে কোন্ শ্রেণীর লোকদের বিদ্রূপ করা হইয়াছে?

মা

স্নেহবিহ্বল, করুণা-ছলছল
শিয়রে জাগে কার আঁখি রে!
মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী সুধা
এনেছে অশরণ লাগি রে।
শ্রান্ত অবিরত যামিনী-জাগরণে,
অবশ কৃশ তনু মলিন অনশনে,

আত্মহারা, সদা বিমুখী নিজ সুখে,
তপ্ত তনু মম করুণা-ভরা বুকে
টানিয়া লয় তুলি, যাতনা-তাপ ভুলি'
বদন-পানে চেয়ে থাকি রে।
করুণা বরষিছে মধুর সান্ত্বনা,
শান্ত করি মম গভীর যন্ত্রণা ;
স্নেহ-অঞ্চলে মুছায়ে আঁখিজল
ব্যথিত মস্তকে চুম্বে অবিরল,
চরণ-ধূলি সাথে আশিস্ দেয় মাথে,
সুপ্ত হৃদি উঠে জাগি রে।'
আপনি মঙ্গলা মাতৃরূপে আসি'
শিয়রে দিল দেখা করুণা পরকাশি ;
বক্ষে ঝরে চির-পীযূষ-নির্ঝর,
নিরাশ্রয় শিশু-অসীম-নির্ভর,
নমো নমো নমঃ জননি দেবী মম !
অচলা মতি পদে মাগি রে।

— রজনীকান্ত সেন

অনুশীলনী

১। এই কবিতায় জননীর সন্তানস্নেহ সম্বন্ধে কি বলা হইয়াছে ?

২। ব্যাখ্যা কর ঃ—'শ্রান্ত অবিরত……চেয়ে থাকি রে।'

দূরযাত্রী

তোমাদের তরে থাকুক সরস
শ্যামল মাটি,
ঠাণ্ডা দাওয়ায় বিকেলে বিছানো
শীতল-পাটি।
বিছানায় থাক্ নরম চাদর,
চাঁদের ছিটে,
ছোট করে' রাখ নিজের পরিধি
কাঠে ও ইটে।
উত্তাল ঢেউয়ে পাড়ি দিই মোরা,
উড়াই পাল,
তোমাদের ঘিরে চারিদিকে থাক্
ঘন দেয়াল।
সার বেঁধে বসে' দাঁড় হেনে জল
কর্‌ছি ঘোলা ;
উপরে ঝড়ের, নীচে সাগরের
নাগর-দোলা।
জল-তল হ'তে হাঙর-কুমীর
মার্‌ছে ঘাই,
প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর সাথে
করি লড়াই।

সার বেঁধে বসে' দাঁড় টানি মোরা,
উড়াই পাল,
ঢেউ-ভুজঙ্গ মারছে ছোবল,
ডাকে কোটাল।
জীবনের স্বাদ বুঝলুম্ ভাই
আমরা বরং,
জলতরঙ্গে বাজাই আমরা
জলতরঙ।
দূর বিদেশের মাটির গন্ধ
লাগ্‌ছে নাকে,
কোন্ আকাশের সুদূর তারাটি
মোদের ডাকে।
তারি সন্ধানে পাড়ি মারি মোরা
উড়াই পাল,
দাঁড় বেয়ে মোরা বাধা-নিষেধের
ভাঙি আড়াল

—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অনুশীলনী

১। কবিতাটি পড়িয়া কি বুঝিলে লিখ।

২। সাগরের ঢেউকে নাগর-দোলা বলা হইয়াছে কেন?

৩। নিম্নলিখিত লাইন দুইটির ব্যাখ্যা লিখ :—

"ছোট করে' রাখো নিজের পরিধি
কাঠে ও ইটে।"

সাধনা

মোছ আঁখি, মনে কর এ বিশ্ব সংসার
কাঁদিবার নহে শুধু বিশাল প্রাঙ্গণ,
রাবণের চিতাসম যদিও আমার
জ্বলিছে জ্বলুক প্রাণ, কেন গো ক্রন্দন?
অপরের দুঃখ-জ্বালা হবে ঘুচাইতে;
হাসি-আবরণ টানি' দুঃখ ভুলে যাও;
ব্যথিত জনের তপ্ত অশ্রু মুছাইতে
আপনার সবকিছু বিশ্বে ঢেলে দাও।
হায় হায় জনমিয়া যদি না ঘুচালে
মানবের দুঃখ-জ্বালা, আকুল ক্রন্দন;
তাপিতের আঁখিজল যদি না মুছালে,
তবে বৃথা বেঁচে থাকা, বৃথা এ জীবন।
আপন সুখের লাগি করে যে কামনা,
ব্যর্থ তার জীবনের চরম সাধনা।

—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (পরিবর্ত্তিত)

অনুশীলনী

১। কবিতাটির সারমর্ম্ম নিজের ভাষায় লিখ।

২। রাবণের চিতাসম—এ কথার অর্থ কি?

৩। ব্যাখ্যা লিখ :—"আপন সুখের লাগি······চরম সাধনা।"

বাসনা

ছুট্‌ব আমি সরল প্রাণে পর্ণকুটীর হ'তে,
ধান-নাচানো মাঠের হাওয়ায় ছুট্‌ব আলিপথে।
বনের মাথায় আঁধার ফুঁড়ে
শুকতারাটি জাগ্‌বে দূরে,
কাণ জুড়াবে পাখীর গানে সুরের মিঠে স্রোতে।
এলিয়ে দেব নগ্ন বাহু গাঙ্গের রাঙ্গা জলে,
ঝাঁপিয়ে পড়ে' উজান যাব ঢেউয়ের টলমলে ;
তুচ্ছ করে' জোয়ার-ভাঁটা
এপার-ওপার সাঁতার কাটা,
নাচ্‌বে আলো জলের বুকে, নীল আকাশের তলে।
বুক ফুলায়ে হাল ধরিব, পাল তুলিব নায়ে,
মাঝ গঙ্গায় জাল ফেলিব উদাস আদুল গায়ে।
গাংচিলেরা ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়্‌বে ভাঙ্গা পাড়ের বাঁকে,
ডাক্‌বে চাতক 'ফটিক জল' মেঘের ছায়ে ছায়ে।
বর্ষা যখন ছড়িয়ে দেবে মোতির সাতনরী ;
কদম-কেশর শিউরে উঠে পড়্‌বে ঝরি' ঝরি'।
মাঠের কোণে যাবে দেখা
বৃষ্টিধারার চিকে ঢাকা
কেয়াঝাড়ের মাথার 'পরে নারিকেলের সারি।
অবাক্ হ'য়ে দাওয়ায় বসে' দেখ্‌ব দুপুর বেলা,
পরিষ্কার ওই আকাশ-আলোয় পাখীর সাঁতার-খেলা ;

কাঠঠোক্‌রা ঠোঁটের ঘায়ে
গাছের মোটা গুড়ির গায়ে
সুড়ঙ্গটি কর্‌ছে গভীর, পাখায় রঙের মেলা।
কাঠবিড়ালী বেড়ায় ছুটে' রান্নাঘরের চালে ;
জিহ্বা মেলে' ধুঁক্‌ছে ভুলো সাম্‌নে ঢেঁকিশালে।
গাছভরা ঐ পেয়ারা-ফুলে
মৌমাছিরা পড়্‌ছে ঢুলে',
রয়ে' রয়ে' দোয়েল ডাকে বাবলা গাছের ডালে।
তল্‌তা বাঁশের ছিপ্‌টি হাতে, ছাতিম-তলার ঘাটে
রইব বসে' রৌদ্রমাখা বৃষ্টিজলের ছাটে ;
চারের মিষ্ট গন্ধে উতল
উঠ্‌বে লাফিয়ে রোহিত-চিতল—
উড়িয়ে ঢাউস গ্রামের ছেলে মিল্‌বে খোলা মাঠে।
কামার-শালে বস্‌ব গিয়ে রৌদ্র এলে পড়ি',
কয়লাগুলো রাঙ্গিয়ে দিয়ে টান্‌ব জাঁতার দড়ি ;
ঝুলের কাছে জম্‌বে ধোঁয়া,
কাঁপিয়ে নেয়াই পিট্‌ব লোহা,
ছিটিয়ে দেব আগুন-যূঁই—আলোর ছড়াছড়ি।

—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুশীলনী

১। ব্যাখ্যা কর :—'বর্ষা যখন……সাতনরী।'

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ বল :—পর্ণকুটীর, নগ্ন, তুচ্ছ, উদাস, কদম-কেশর, উতল।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর :—নগ্ন, তুচ্ছ, অবাক্‌, জিহ্বা।

কামনা

হে মোর দেবতা প্রভু, মম চিত্তমাঝে
প্রকাশিত হও তব মহিমার সাজে।
ব্যথা দিয়ে দুঃখ দিয়ে হিয়ারে আমার
আঘাতে আঘাতে কর মহৎ উদার।
শক্তি মোরে দাও প্রভু, যেন চিত্তে মম
মানবে বরিতে পারি মোর ভ্রাতা সম।
শত্রুমিত্র ভেদাভেদ ভুলি' যেন নাথ
কল্যাণে মিলিতে পারি সকলের সাথ।
দারিদ্র্য কেন গো র'বে ? কেন অত্যাচার
তোমার দয়ার রাজ্যে ? কেন অবিচার
সুন্দর ভুবনে তব ? হে আমার প্রভু,
প্রেমমাঝে হিংসা কেন জেগে রয় তবু ?
দূর কর, দূর কর সর্ব্ব আবর্জ্জনা,
সকলের হ'য়ে মাগি তোমারি মার্জ্জনা।

—হুমায়ুন কবীর

অনুশীলনী

১। কবি কি কি কামনা করিয়াছেন ?
২। সর্ব্ব আবর্জ্জনা বলিতে কবি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন ?

কণিকা

ছোট বালুকার কণা, বিন্দু বিন্দু জল
গড়ি' তোলে মহাদেশ; সাগর অতল।
মুহূর্ত্ত নিমেষ কাল, তুচ্ছ পরিণাম,
গড়ে যুগ যুগান্তর——অনন্ত মহান্।
প্রত্যেক সামান্য ত্রুটি, ক্ষুদ্র অপরাধ,
ক্রমে টানে পাপ-পথে, ঘটায় প্রমাদ;
প্রতি করুণার দান, স্নেহপূর্ণ বাণী
এ ধরায় স্বর্গসুখ নিত্য দেয় আনি'।

—প্রিয়ম্বদা দেবী

অনুশীলনী

১। কবিতাটির সারমর্ম্ম কি?
২। ব্যাখ্যা কর :—"প্রত্যেক সামান্য……..দেয় আনি'।"

আশ্রম

প্রীতিপূর্ণ শান্তিপূর্ণ দেখিনি এমন ;—
যেমন মহর্ষি ব্যাস, যোগ্য তপোবন।
কোথাও বিশাল বট বিটপী-ঈশ্বর
প্রসারি' পল্লব-ছত্র আছে দাঁড়াইয়া
সৃজি' ছায়াতলে শাখা-কক্ষ মনোহর।

স্থানে-স্থানে রাজমন্ত্রী অশ্বত্থ, তমাল
করিছে কানন-রাজ্য-মহত্ত্ব বৰ্দ্ধন।
দূরদর্শী, শীর্ণকায়, জটাজূট-শির
কানন-সমাজ হ'তে বহু উৰ্দ্ধে তুলি'
দাঁড়ায়ে খৰ্জ্জুর তাল বন-ঋষিদ্বয়,
ধ্যানে অবিচল দেহ নিৰ্ব্বাক উভয়।
কেবল কখন বনকুক্কুটের ধ্বনি,
তীব্র শিখিকণ্ঠ, ঋষি-শিশু কণ্ঠাভাস,
ছিন্ন বাঁশরীর তান প্রতিধ্বনি তুলি'
কি মধুরে গিরি-অঙ্গে যাইছে উছলি।
কানন-বিহঙ্গ কোথা পত্রে আবরিত
বরষিছে কিবা শান্তি, কি সুধা সঙ্গীত!
ভারতের পুণ্যাশ্রম মহাতীর্থ সব,
ঝড়পূর্ণ জগতের শান্তির নিবাস।

—নবীনচন্দ্র সেন

অনুশীলনী

১। কবিতাটি অনুসরণ করিয়া নিজের ভাষায় আশ্রমের বর্ণনা কর।

২। ব্যাখ্যা কর :—(ক) দূরদর্শী……উভয়।' (খ) 'ভারতের পুণ্যাশ্রম……নিবাস।'

৩। শব্দার্থ লিখ :—বিটপী, দূরদর্শী, অবিচল, বিহঙ্গ।

পথের পাথর

পথের মোড়ে ছিল পড়ে প্রকাণ্ড এক পাথর ;
কত কালের কেউ না তাহা জানে ;—
হুঁচোট খেয়ে প'ড়ত সবাই,—সরিয়ে দিতে কাতর ;—
এমন কাণ্ড দেখেছ কোন্‌খানে ?
আঁধার রাতে আছাড় খেয়ে তর্কবাগীশ ম'শাই
অতর্কিতে ভাঙ্‌লেন ডা'ন হাত ;
বাঁ-হাতখানা মচ্‌কালে এক রাতকাণা কোন্ গোঁসাই,
—গাঁয়ের লোকের নেই তবু দৃক্‌পাত।
চৌধুরীদের বড়বাবু নিত্য জুড়ী হাঁকায়,—
উল্টে গাড়ী জখম হোলো ঘোড়া ;
ধাক্কা লেগে গোফুর সেখের গোরুর গাড়ীর চাকায়
নতুন গোরুর একটা হোলো খোঁড়া।
ছোট-বড় এমনতর আপদ-বিপদ সবার
ঘ'টল কত নেইকো লেখাজোখা,—
পথের আপদ সরিয়ে শেষে নিষ্কণ্টক হ'বার
ক'রল উপায় এক চাষী একরোখা।
শক্ত সবল হু'টি হাতে পাথরখানা ধ'রেই
বিপুল বলে দিলে বিষম টান,
পথ ছাড়িয়ে হু'হাত দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ে'ই
কঠিন পাথর নিমেষে খান্ খান্।

অবাক্ চোখে দেখলে চাষী, সেই পাথরের তলায়
মোহরভরা আছে সোনার ঘড়া।
বিস্ময়ে আর উল্লাসে তার স্বর না সরে গলায়,--
বিধির সে দান মাথায় নিল ত্বরা।
সেই কলসের গায়ে লেখা—"ধরায় যারা অলস,
তা'দের জীবন কেবল বোঝার ভার ;
পথিক, তুমি পরিশ্রমী, লও এ সোনার কলস—
কঠিন শ্রমের এইতো পুরস্কার।"

—শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু

অনুশীলনী

১। কবিতাটি পড়িয়া কি শিখিলে ?
২। মোহরের ঘড়ার গায়ে কি লেখা ছিল ?
৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিভিন্ন প্রতিশব্দ লিখ :—
গোরু, পথ, ধরা, সোনা।

মেথর

কে বলে তোমারে, বন্ধু, অস্পৃশ্য, অশুচি ?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমার পিছনে।
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে' যেত বনে।
শিশুজ্ঞানে সেবা তুমি করিতেছ সবে,
ঘুচাইছ রাত্রিদিন সর্ব্ব ক্লেদ-গ্লানি।
ঘৃণার নাহিক কিছু স্নেহের মানবে,—
হে বন্ধু! তুমিই একা জেনেছ সে বাণী।
নির্ব্বিচারে আবর্জ্জনা বহ অহর্নিশ,
নির্ব্বিকার সদা শুচি তুমি গঙ্গাজল।
নীলকণ্ঠ ক'রেছেন পৃথ্বীরে নির্ব্বিষ ;
আর তুমি ? তুমি তা'রে করেছ নির্ম্মল।
এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে—
কল্যাণের কর্ম্ম করি' লাঞ্ছনা সহিতে।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ বল।

২। **শব্দার্থ বল** :—অস্পৃশ্য, শুচিতা, ক্লেদ-গ্লানি, নির্ব্বিচারে, নির্ব্বিষ, নীলকণ্ঠ, কল্যাণ।

৩। **ব্যাখ্যা কর** :—

"নীলকণ্ঠ ক'রেছেন……

……লাঞ্ছনা সহিতে।"

হরিদাস

সাধক হরিদাস বাজায়ে একতারা
গাইয়া ফেরে গিরিবনে,
বনের পশুপাখী, তটিনী-তট-শাখী,
তার সঙ্গীত শোনে।
ঘুরে সে পথে-পথে পল্লী-জনপদে,
পাগল ভিখারীর সাজে,
রাজার সভাতে বা ধনীর দ্বারদেশে,
আসে না নগরের মাঝে।
একদা সম্রাট্ কহিল, "তানসেন,
তোমার গুরু যেই জন,
তাহার সঙ্গীত শুনাতে হবে আজ,
মাগি হে তাঁর দরশন।"
এতেক কহি' নৃপ ছদ্মবেশ ধরি'
চলিল তানসেন-সাথে।
শুনিল প্রাণ ভরি'—বিভোর হরিদাস
গাহিল একতারা হাতে।
কহিল, "তানসেন, রাগিনী তাল লয়ে
অনেক গেয়েছ ত গান ;
আজি যা' শুনিলাম, তাহার মত কই
আকুল করে না ত প্রাণ!"

কহিল তানসেন, "কাহার সাথে কা'র
তুলনা কর, হায়- ভূপ !
গোমুখী-উৎসের মন্দাকিনী কোথা,
রুদ্ধবারি কোথা কূপ ?
গন্ধমধুভরা কোথা সে সরোরুহ,
ঋষি যা' সঁপে দেবতায়,
কোথা এ উপবনে রঙীন্ গুল, যাহা
বিলাস লাগি ফুটে, হায় !
ভারত-ভূপ ! তব আদেশ মত গাই
আমি এ লোকসভা-মাঝে,
বিশ্ব-ভূপালের সভায় গা'ন তিনি,
তুলা কি তার সাথে সাজে ?"

—শ্রীকালিদাস রায়

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ বল :—তটিনী, ছদ্মবেশ, উৎস, রুদ্ধবারি, সরোরুহ, বিলাস।

২। কবিতাটির গল্পাংশ নিজের ভাষায় লিখ।

৩। ব্যাখ্যা কর :—(ক) গোমুখা-উৎসের……কূপ ?
(খ) গন্ধমধুভরা……ফুটে হায়।

৪। ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ :— পল্লী-জনপদ, গোমুখী-উৎস, গন্ধমধুভরা, লোকসভা, ভারত-ভূপ।

বাংলাভাষা

মোদের গরব, মোদের আশা,
আ-মরি বাংলা ভাষা !
(ওগো) তোমার কোলে, তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালবাসা !
কি যাদু বাংলা গানে,
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।
ঐ ভাষাতেই নিতাই-গোরা
আন্‌ল দেশে ভক্তি-ধারা ;
আছে কই এমন ভাষা
এমন দুঃখ-ক্লান্তি-নাশা।
বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন,
হেম, মধু, বঙ্কিম ও নবীন,
ঐ ভাষারই মধুর রসে
বাঁধল সুখে মধুর বাসা।
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে
আন্‌ল মালা জগৎ জিনে ;
তোমার চরণ-তীর্থে মা-গো,
জগৎ করে যাওয়া-আসা।

ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে
ডাকনু মায়ে মা মা ব'লে,
ঐ ভাষাতেই বলব হরি
সাঙ্গ হ'লে কাঁদা-হাসা।

—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

অনুশীলনী

১। ব্যাখ্যা কর :— (ক) 'ঐ ভাষাতেই........ভক্তিধারা।' (খ) 'বাজিয়ে রবি.........যাওয়া আসা।'

দেবতার বিদায়

দেবতা-মন্দির-মাঝে ভকত প্রবীণ
জপিতেছে জপমালা বসি' নিশিদিন।
হেনকালে সন্ধ্যাবেলা, ধূলিমাখা দেহে,
বস্ত্রহীন জীর্ণ দীন পশিল সে গেহে ;
কহিল কাতরকণ্ঠে,—"গৃহ মোর নাই,
একপাশে দয়া ক'রে দেহ মোরে ঠাঁই !"
সসঙ্কোচে ভক্তবর কহিলেন তারে,—
"আরে আরে অপবিত্র ! দূর হ'য়ে যারে।"

সে কহিল,—"চলিলাম," চক্ষের নিমেষে
ভিখারী ধরিল মূর্ত্তি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে,—"প্রভু, মোরে কি ছলে ছলিলে!"
দেবতা কহিল,—"মোরে দূর করি' দিলে!
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুশীলনী

১। কবিতাটির সারমর্ম্ম নিজের ভাষায় লিখ।
২। শব্দার্থ বল :—প্রবীণ, জীর্ণ, দীন, সসঙ্কোচে, অপবিত্র।
৩। **সরল ব্যাখ্যা কর :—**

"দেবতা কহিল ......
......আমি থাকি ঘরে।"

নালন্দা দর্শনে

অতীতের শত স্মৃতিব্যথা বুকে ল'য়ে,
কালের কঠোর ঝঞ্ঝা-আঘাত স'য়ে—
দাড়ায়ে রয়েছ জীর্ণ শরীরে
মৃত্যুরে করি' জয় ;
নমি তব পদে অতীত দিনের বিশ্ববিদ্যালয়।
হেথাকার এই জ্ঞানের বিরাট্
মুক্ত যজ্ঞাগারে—
পুরোহিত ছিল বাঙ্গালীর ছেলে ;
নমি তাঁরে বারে বারে।
হেথাকার প্রতি ধূলিকণা আজো
পথিকের কানে কয়—
'বাঙ্গালীর ছেলে মহাপণ্ডিত
শীলভদ্রের জয়।'
এইখানে আসি' চীনদেশ হ'তে
দুর্গম পথ বাহি'
পরিব্রাজক বাঙ্গালীর পদে
হয়েছিল ধরাশায়ী—
বাণীযজ্ঞের এই পূত বেদিমূলে।
অতীতের সেই গৌরব-স্মৃতি বাঙ্গালী যায় নি ভুলে।

বাণীযজ্ঞের হুতাশন আজি
নিভেছে যজ্ঞাগারে,
শুধু পড়ে’ আছে ভস্ম তাহার
হেথা-হোথা চারিধারে।
তবু ক্ষণে ক্ষণে স্মৃতির পবনে ভেসে—
যজ্ঞ-ধূমের গন্ধ ভাসিয়া আসে—
অতীতের দূর স্বপ্ন-স্মৃতির মত ;
মহিমার ধীর শান্ত আবেশে
মাথা হয়ে আসে নত।
জ্ঞান-রত্নের ভাণ্ডারী তুমি,
তোমারে প্রণাম করি ;
কত শত জ্ঞান-ভিখারী হেথায়
করে’ গে’ছে মাধুকরী।
সেই নালন্দা বিদ্যাপীঠ যে তুমি,
চরণে তোমার বাঙ্গালীর ছেলে আমি—
নমিতেছি বারে বারে,
তোমার ভগ্ন বিরাট সিংহদ্বারে।

—শ্রীপ্রশান্তকুমার চৌধুরী

অনুশীলনী

১। নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কি জান লিখ।
২। চীনদেশ হইতে নালন্দায় কে আসিয়াছিলেন ?
৩। শীলভদ্র কে ? ‘মাধুকরী’ কথার অর্থ কি ?